শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা

দাখিল নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা

দাখিল

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর আ ব ম ফারুক
আবু মুহম্মদ
মোঃ আবদুল হক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুল বিষয়টি 'সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন' এই জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির **শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা** বিষয়টি মূলত ব্যাবহারিক বিষয়। তাই হাতে কলমে শিক্ষার জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অংশের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বইটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা, পুষ্টিজ্ঞান, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, প্রজননস্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। একইসাথে বিভিন্ন ধরনের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার যথার্থ নিয়মকানুন জেনে একজন সুস্থ ও কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	সুস্থজীবনের জন্য শারীরিক শিক্ষা	১–১০
দ্বিতীয়	শারীরিক সক্ষমতা	১১–১৯
তৃতীয়	মানসিক স্বাস্থ্য ও অবসাদ	২০–২৭
চতুর্থ	স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসেবা	২৮–৩৮
পঞ্চম	স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টি	৩৯–৪৮
ষষ্ঠ	মাদকাসক্তি ও এইডস	৪৯–৫৯
সপ্তম	বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য	৬০–৭৪
অষ্টম	দলগত খেলা	৭৫–১১৪
নবম	অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার	১১৫–১৩৮
দশম	খেলাধুলার দুর্ঘটনা	১৩৯–১৫০

প্রথম অধ্যায়

সুস্থজীবনের জন্য শারীরিক শিক্ষা

প্রাচীনকালে শারীরিক শিক্ষা বলতে শরীর সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে বোঝানো হতো। আধুনিককালে এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। শরীর সম্বন্ধীয় শিক্ষা বা শারীরিক কসরতকে শারীরিক শিক্ষা নয় শরীরচর্চা বলে। শারীরিক শিক্ষা শুধু শরীর নিয়েই আলোচনা করে না, এর সাথে মানসিক বিকাশ ও সামাজিক গুণাবলি কীভাবে অর্জিত হয় সে ব্যাপারেও সহায়তা করে। শরীর ভালো না থাকলে মন ভালো থাকে না, কাজে মন বসে না, তাই দেহ ও মনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন' প্রাচীন এই প্রবাদটি সর্বযুগে সর্বকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে শারীরিক উন্নয়ন, মানসিক বিকাশ ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনই হলো শারীরিক শিক্ষা। শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচি নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে সুস্থ জীবন লাভ করা যায়। একজন শিক্ষার্থী শারীরিক শিক্ষা লাভ করে সুস্থ দেহে সুন্দর মনের অধিকারী হয়ে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সুস্থজীবনের জন্য শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচি যথা আন্তঃশ্রেণি, আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানাদি সঠিকভাবে পালন করতে পারব।
- শারীরিক শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হব।

পাঠ–১ : শারীরিক শিক্ষা : শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলতে বা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমেই শিক্ষা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শারীরিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শিক্ষা শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদান করলে শারীরিক শিক্ষা কী তা বোঝা সহজ হবে। শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি নানাভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা বিভিন্ন অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। শিক্ষা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নয়, ব্যক্তির শারীরিক, সামাজিক, আবেগিক ও অন্যান্য দিকেরও সুষম বিকাশ সাধন করে। শিক্ষা ব্যক্তিজীবনের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়েই ঘটে না, শিক্ষা জীবনব্যাপী বিস্তৃত। শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা অর্জিত হয় পরিবারে, সমাজে, খেলার মাঠে এবং সর্বত্র।

শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা–

শিক্ষা ব্যক্তির সর্বোচ্চ সম্ভাব্য শারীরিক ও আত্মিক সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ সাধন করে। (Education helps in the body and soul of the pupil all the beauty and all the perfection he is capable of) Plato. শিক্ষা হলো সুস্থ শরীরে সুস্থ মন তৈরি (Education is the creation of sound mind in a sound body)। শরীর, মন ও আত্মার সর্বোচ্চ বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা।

শারীরিক শিক্ষা ও শিক্ষার সম্পর্ক সম্বন্ধে সি. এ. বুচার (C.A. Bucher) বলেছেন–"শারীরিক শিক্ষা, শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শারীরিক শিক্ষা হলো সুনির্দিষ্ট শারীরিক কাজকর্মের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, আবেগিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা।" এ উক্তি থেকে বোঝা যায় শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক।

ডি.কে. ম্যাথিউস বলেছেন– শারীরিক কার্যকলাপের দ্বারা অর্জিত শিক্ষাই শারীরিক শিক্ষা।

হপ স্মিথ ও ক্লিফটন বলেছেন– বিজ্ঞানসম্মত ও কৌশলগত অঙ্গসঞ্চালনের নাম শারীরিক শিক্ষা।

জে. বি. ন্যাশ বলেছেন– ''শারীরিক শিক্ষা গোটা শিক্ষার এমন একদিক যা মাংসপেশির সঠিক সঞ্চালন ও এর প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যক্তির দেহের ও স্বভাবের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে।''

উল্লিখিত উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শারীরিক শিক্ষার মূল কথা হলো– দেহ ও মনের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষম উন্নয়ন, মানসিক বিকাশ সাধন, সামাজিক গুণাবলি অর্জন ও খেলাধুলার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন।

কাজ– ১ : শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞাগুলো পোস্টার পেপারে লিখে দেয়ালে লাগিয়ে রাখ।

পাঠ– ২ : শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সাধারণভাবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই ধারণার মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। অনেক সময় একের জায়গায় অন্যটিকে ব্যবহার করি। কিন্তু এই দুই ধারণা সমার্থক নয়। এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। লক্ষ্য হলো চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল আর উদ্দেশ্য হলো সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ। যেমন– সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠার ক্ষেত্রে লক্ষ্য হলো ছাদ, আর সিঁড়ির এক একটি ধাপ হলো উদ্দেশ্য। লক্ষ্যের অস্তিত্ব মানুষের কল্পনায়, তার রূপায়ণ সম্ভব হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো বাস্তব। মানুষ উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে এমনকি তার পরিমাপও সম্ভব। শারীরিক শিক্ষাবিদগণ শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বেশ কয়েকটি অন্তর্বর্তী পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন শারীরিক শিক্ষাবিদগণ শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করেছেন : **উইলিয়ামস্**-এর মতে "শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির শারীরিক, সামাজিক ও অন্যান্য দিকের সুষম উন্নতি ঘটিয়ে ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা।"

বুক ওয়াল্টার বলেছেন– "শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিকসমূহের সুসমন্বিত বিকাশ সাধন।" এই বিকাশ সাধনের উপায় হলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও নিয়মনীতি অনুসারে পরিচালিত খেলাধুলা, ছন্দময় ব্যায়াম এবং জিমন্যাস্টিকস্ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ। এগুলোই শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষজ্ঞগণ কিছু উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত হলেও কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে মতের ভিন্নতাও প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব। বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মতামত বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১. শারীরিক সুস্থতা অর্জন।

২. মানসিক বিকাশ সাধন।

৩. চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন।

৪. সামাজিক গুণাবলি অর্জন।

১. শারীরিক সুস্থতা অর্জন

ক. খেলাধুলার নিয়মকানুন মেনে ভালো করে খেলতে পারা।

খ. কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল করা।

গ. স্নায়ু ও মাংসপেশির সমন্বয় সাধনে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ঘ. দেহ ও মনের সুষম উন্নতি করা।

ঙ. সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করা।

চ. সহিষ্ণুতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করা।

২. মানসিক বিকাশ সাধন

ক. উপস্থিত চিন্তাধারায় বিকাশ সাধন।

খ. নৈতিকতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

গ. সেবা ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

ঘ. বিভিন্ন দলের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠা।

৩. চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন

ক. আনুগত্যবোধ ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পাওয়া।

খ. খেলাধুলার মাধ্যমে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হওয়া।

গ. খেলোয়াড়ি ও বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব গড়ে উঠা।

ঘ. প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব গড়ে উঠা।

ঙ. আত্মসংযমী হওয়া ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।

৪. সামাজিক গুণাবলি অর্জন

ক. নেতৃত্বদানের সক্ষমতা অর্জন ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন করা।

খ. বিনোদনের সাথে অবসর সময় কাটানোর উপায় জানা।

গ. বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা।

ঘ. সকলের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

শারীরিক শিক্ষাবিদদের মতামত থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষার মতোই ব্যক্তিসত্তার সর্বোচ্চ ও সুষম বিকাশ সাধন করে থাকে এবং পরিকল্পিতভাবে খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জনে সাহায্য করে।

কাজ– ১ : শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্যগুলো পোস্টার পেপারে লিখে দেয়ালে লাগাও।

কাজ– ২ : সামাজিক উদ্দেশ্যগুলো দ্বারা কী অর্জন করা যায় দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো

কাজ– ৩ : শারীরিক সুস্থতা অর্জনের উদ্দেশ্যগুলো বোর্ডে লিখে দেখাও।

পাঠ– ৩ : শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : শারীরিক শিক্ষা দেহ ও মনের সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করে। শারীরিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার পূর্ণতা আসে না। যেসব গুণ থাকলে দেশের প্রতিটি নাগরিক সুস্থ, সবল ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠে এবং নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়, শারীরিক শিক্ষা সেই গুণাবলি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। মানুষ সমাজে স্বীকৃতি পেতে চায়। এই স্বীকৃতির মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাই নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব গঠনেও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। আমাদের দেহ কতকগুলো অঙ্গের সমষ্টি। আবার প্রত্যেকটি অঙ্গ নানাপ্রকার মাংসপেশি, হাড়, শিরা, ধমনি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। দেহকে ঠিক রাখার জন্য সব সময়ই দেহের মধ্যে কতকগুলো প্রক্রিয়া কাজ করছে। এই প্রক্রিয়াগুলো সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা। উপযুক্ত খাবার, অঙ্গ সঞ্চালন, বিশ্রাম ও ঘুম এগুলোর অভাবে শরীর সঠিকভাবে বৃদ্ধি পায় না ও সুস্থ থাকে না। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা দৈহিক ও মানসিক বিকাশের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করছে।

বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো–
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সমাজ সংরক্ষণ, সমাজ সংস্কার ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ ও দেশের কাছে দায়বদ্ধ। দেশের মানবসম্পদকে সঠিকভাবে বিকশিত করা এবং আজকের শিশুকে আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ মুলত দ্বিমুখী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ হলো শিশু-শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশ সাধন করা। এর মধ্যে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক দিক অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় কাজ হলো শিক্ষার্থীর জৈবিক সত্তাকে সামাজিক সত্তায় রূপান্তরিত করা। এর মধ্যে শিশুর চারিত্রিক ও মূল্যবোধের উন্নতি এবং সামাজিক বিকাশ অন্তর্ভুক্ত।

এই কাজের মধ্যে প্রথমটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কাজ এবং দ্বিতীয়টি তার পরোক্ষ দায়িত্ব। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। **মাসলো**-এর মতে শিক্ষার্থীর এই প্রয়োজন তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। যেমন–

১. শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন (Biological need)

২. মানসিক ও আত্মিক পরিপূর্ণতার প্রয়োজন (Psychological need)

৩. সামাজিক প্রয়োজন (Social need)

১. শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন : শিক্ষার্থীর শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন পূরণে শারীরিক শিক্ষা প্রত্যক্ষ কাজ করে। এ ব্যাপারে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা হলো–

- ক. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর গতিশীল কাজের জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করে।
- খ. শিক্ষার্থীর দৈহিক গঠন সুন্দর ও মজবুত করে।
- গ. শিক্ষার্থীর শারীরিক সক্ষমতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ঘ. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- ঙ. শিক্ষার্থী খেলাধুলার কৌশল শেখার মাধ্যমে খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন করে।
- চ. শারীরিক শিক্ষা সুস্থ মনের জন্য সুস্থ দেহ গড়ে তোলে।

২. মানসিক ও আত্মিক পরিপূর্ণতা প্রয়োজন

ক. শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিমত্তার ভিত গড়ে তোলে।

খ. পড়াশোনার একঘেয়েমিতা দূর করে।

গ. শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়।

ঘ. আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরতা, আত্মোপলব্ধি ও আত্মসম্মান বাড়িয়ে তোলে।

ঙ. পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে।

চ. শিক্ষার্থীর মনে সৃজনশীলতার অনুভূতি জাগ্রত করে।

ছ. ক্ষতিকর নেশা থেকে দূরে রাখে।

জ. চিত্তবিনোদন ও অবসর সময় কাটানোর উপায় নির্বাচনে সাহায্য করে।

৩. সামাজিক প্রয়োজন

ক. প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে।

খ. খেলাধুলায় সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে ও মানসিক গুণ অর্জনে সহায়তা করে।

গ. শারীরিক শিক্ষা নেতৃত্বদানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

ঘ. দেশ ও সমাজের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটায়।

ঙ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে।

চ. শিক্ষার্থীর উদার মানসিকতা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে।

কাজ– ১: শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনগুলো কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো

কাজ– ২ : মানসিক ও আত্মিক প্রয়োজনীয়তাগুলো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৩টি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে ২টি করে প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করতে বলবেন।

কাজ– ৩ : সামাজিক প্রয়োজনগুলো বোর্ডে লিখে দেখাও।

পাঠ–৪ : শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা, ব্যায়াম, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ও বিনোদনমূলক যে সমস্ত কর্মসূচি পরিলক্ষিত হয় তাকে শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি বলে। একজন শারীরিক শিক্ষক যে সমস্ত ক্রীড়াকর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন তাই শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়–

১. অত্যাবশ্যকীয় ক্রীড়া কর্মসূচি (Compulsory Sports Programme)

২. অন্তঃক্রীড়াসূচি (Intramural Sports)

৩. আন্তঃক্রীড়াসূচি (Extramural Sports)

২০২৫

১. **অত্যাবশ্যকীয় ক্রীড়া কর্মসূচি (Compulsory Sports Programme)** : একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারি নির্দেশাবলি, শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস, প্রতিযোগিতা, প্রাত্যহিক সমাবেশ ও স্থানীয় নির্দেশনা ইত্যাদি সবই অত্যাবশ্যকীয় ক্রীড়াকর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। এই কর্মসূচিগুলো একজন শারীরিক শিক্ষকের অবশ্যই পালন করতে হয়। সরকারি নির্দেশনাবলি বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক যে সমস্ত নির্দেশনা, যেমন– প্রাত্যহিক সমাবেশ করতে হবে, প্রতিদিন/ সপ্তাহে ৩টি ক্লাস নিতে হবে, আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে, জাতীয় দিবসগুলোতে খেলাধুলা করাতে হবে ইত্যাদিকে বোঝায়। স্থানীয় নির্দেশনা বলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়মকানুনসমূহকে বুঝিয়ে থাকে যেমন– স্কুল ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, বার্ষিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা, দৈহিক উন্নতির পরিমাপের পরীক্ষা নেওয়া, টিফিন প্রোগ্রাম পরিচালিত করা ইত্যাদি।

২. **অন্তঃক্রীড়াসূচি (Intramural Sports)** : ইন্ট্রামুরাল একটি ল্যাটিন শব্দ। Intra অর্থ ভিতরে এবং Mural অর্থ দেয়াল। তাহলে সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় দেয়ালের ভিতরে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের চারি দেয়ালের মধ্যে বা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আকারে যে সমস্ত খেলাধুলা হয় তাকে ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টস বলা হয়। যেমন– বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নবম শ্রেণি বনাম দশম শ্রেণি ক্রিকেট ম্যাচ, অথবা ষষ্ঠ শ্রেণি ক ও খ শাখার মধ্যে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। যদি হাউজ থাকে তাহলে হাউজে হাউজে যে প্রতিযোগিতা হয় তাও এর আওতায় পড়ে। এ ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক বা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বা ১ম বর্ষ বনাম ২য় বর্ষের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিযোগিতা হয় সেগুলোও ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টসের অন্তর্গত। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে যে খেলাধুলা বা প্রতিযোগিতা হয় তাকে ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টস বলে।

৩. **আন্তঃক্রীড়াসূচি (Extramural Sports)** : Extra অর্থ বাইরে, Mural অর্থ দেয়াল অর্থাৎ দেয়ালের বাইরে যে সমস্ত খেলাধুলা হয় তাকে আন্তঃক্রীড়াসূচি (Extramural Sports) বলা হয়। যে সমস্ত খেলাধুলা বা প্রতিযোগিতা এক স্কুলের সাথে অন্য স্কুল, এক কলেজের সাথে অন্য কলেজের মধ্যে খেলা হয় তাকে আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলা হয়। যেমন– আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃক্লাব ইত্যাদি প্রতিযোগিতা বোঝায়। এ সমস্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজ দলের যোগ্যতা যাচাই করা যায়। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় বিভিন্নমানের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করে। ফলে ভালো খেলোয়াড়ের সাহচর্যে এসে তাদের আচার-ব্যবহার, উন্নতমানের কৌশল ইত্যাদি থেকে তারা অনেক কিছু শিখতে পারে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দলগত সমঝোতা ও উৎকর্ষ বাড়ে। প্রতিযোগিতার মনোভাব ও সৌহার্দ বৃদ্ধি পায়।

কাজ–১ : শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিগুলো দলগতভাবে আলোচনা করো

কাজ–২ : অত্যাবশ্যকীয় ক্রীড়া কর্মসূচি বলতে কী বোঝ–শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে লিখে দেখাও।

কাজ–৩ : ইন্ট্রামুরাল ও এক্সট্রামুরাল স্পোর্টসের পার্থক্যগুলো পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দাও।

পাঠ–৫ : বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষার সাথে শারীরিক শিক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষাকে পূর্ণতা দান, কার্যকর ও অর্থবহ করার জন্য শারীরিক শিক্ষা অন্যতম পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ইউরোপের পুনর্জাগরণেরও (রেনেসাঁ) আগে শিক্ষা নিয়মকানুনের শৃঙ্খলে বাঁধা ছিল। এ সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা বলতে আলাদা কিছু ছিল না। সামরিক শক্তির অনুষঙ্গ হিসেবে শারীরিক শিক্ষাকে বিবেচনা করা হতো। রাষ্ট্রের নাগরিককে রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণে গড়ে তোলার প্রয়োজনে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল সংস্কার সাধিত হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল জাতি গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচির প্রচলন হয়। নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োগ প্রভৃতি স্তর পার হয়ে আধুনিক শারীরিক শিক্ষার জন্ম হয় ইউরোপে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর উপযোগিতা প্রমাণিত হওয়ায় পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে ইউরোপের শারীরিক শিক্ষার পদ্ধতি ও কর্মসূচি সীমিত আকারে চালু হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পরে তৎকালীন পাকিস্তানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু হয়। সে সময়ের সরকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ, খেলার মাঠ, ক্রীড়াসরঞ্জাম, আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রচলন শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে শারীরিক শিক্ষাকর্মসূচি বজায় থাকে।

বাংলাদেশে শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও কর্মসূচিভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রশাসনিকভাবে যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রণালয় শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব পালন করে। এর অধীনে ক্রীড়া অধিদপ্তর দেশের ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মসূচির তদারকি করে থাকে। এসব কলেজ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে শিক্ষকগণ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এসব শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকের মাধ্যমে শারীরিক শিক্ষাকর্মসূচির বাস্তবায়ন তথা খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়া ক্রীড়া অধিদপ্তরের অধীনে কর্মরত জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে থাকে অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষা অধিদপ্তরে শারীরিক শিক্ষা বিভাগে বছরে দুইবার জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া তাদের ব্যবস্থাপনায় স্কুল পর্যায়ের শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স কোর্স নিয়মিত পরিচালিত হয়।

শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' বিষয়টিকে ৬ষ্ঠ–৮ম শ্রেণি এবং 'শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা' বিষয়টিকে ৯ম–১০ম শ্রেণিতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এজন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকরা শারীরিক শিক্ষার নির্দেশিকার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও জ্ঞানদান করে।

স্কুল পর্যায়ে বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শারীরিক শিক্ষাকর্মসূচিকে আরও কার্যকর ও বেগবান করা হয়েছে। সামাজিকভাবে বাংলাদেশে শারীরিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয়জীবনে এর আশু সুফল দৃশ্যমান হবে বলে আশা করা যায়।

কাজ–১ : বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার ধারণা বর্ণনা করো
কাজ–২ : বাংলাদেশে শারীরিক শিক্ষার উপরে যে যে কার্যক্রম আছে তা লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "শারীরিক কার্যকলাপের দ্বারা অর্জিত শিক্ষাই শারীরিক শিক্ষা"–কথাটি কে বলেছেন?

ক. জে. বি. ন্যাশ খ. ডি. কে. ম্যাথিউস

গ. সি. এ. বুচার ঘ. হ্পস্মিথ ও ক্লিফটন

২. শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কোনটি?

ক. নেতৃত্ব বিকাশ খ. ব্যক্তিত্ব অর্জন

গ. চরিত্র গঠন ঘ. সামাজিক বিকাশ

৩. শিক্ষার্থীরা কার তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে সমর্থ হয়?

ক. পরিবারের খ. সমাজের

গ. শিক্ষকের ঘ. বন্ধুবান্ধবের

৪. শারীরিক শিক্ষার চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনের উদ্দেশ্য–

i. আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

ii. বন্ধুসুলভ মনোভাব গড়ে উঠা

iii. আনুগত্যবোধ ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

মেহনাজ অষ্টম শ্রেণির একজন ভালো ছাত্রী। বিদ্যালয়ে গিয়ে সে কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে না এবং তার তেমন কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। তার মা তাকে সারাদিন পড়াশুশোনা করতে বলে। মা তাকে প্রায়ই বলে খেলাধুলা করে বা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সাথে সময় নষ্ট করে ভালো ফলাফল করা যায় না। তাই সারাদিন পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হও। বাড়িতে কোনো মেহমান আসলে সে অন্য ঘরে বসে থাকে। এভাবে কয়েক বছর পর দেখা যায় যে, সে তার জীবন নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন।

৫. মেহনাজের বেলায় কোনটির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে?

ক. শারীরিক খ. মানসিক

গ. চারিত্রিক ঘ. সামাজিক

৬. মেহনাজের উক্ত অবস্থা সমাধানে করণীয়–

i. শরীরচর্চা অনুশীলন

ii. সামাজিকীকরণ

iii. প্রশিক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ নং প্রশ্নটির উত্তর দাও

৭. উপরের চিত্রটি কোন কর্মসূচির আওতাভুক্ত?

ক. অন্তঃক্রীড়া খ. অত্যাবশ্যকীয়

গ. আন্তঃক্রীড়া ঘ. স্থানীয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রায়হানের দাদু রায়হানের স্কুলে গিয়ে খেলার মাঠ, শরীরচর্চার শিক্ষক এবং এদের ব্যায়াম ও খেলাধুলা দেখে উৎফুল্ল হলেন। স্কুল থেকে আসার পর রায়হান তার দাদুকে শারীরিক শিক্ষার আরও কয়েকটি বিষয় যেমন-ক্রীড়া সরঞ্জাম, ইনডোর গেমস, আউটডোর গেমস, আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিষয়ে বর্ণনা করল। রায়হানের দাদু পরবর্তী কয়েকটি দিন স্কুলে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন যে, রায়হানের স্কুলের প্রায় সব শিক্ষার্থীই সুস্থ থাকে।

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ কী?

খ. শিক্ষা জীবনব্যাপী বিস্তৃত-ব্যাখ্যা করো

গ. রায়হানদের স্কুলে শরীর ও মন গঠনে কোন কর্মসূচি চালু আছে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো

ঘ. উপরে বর্ণিত কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের "সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন" গঠন সম্ভব- ব্যাখ্যা করো

২. নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিদিন শরীরচর্চার ও খেলাধুলার জন্য দুইটি পিরিয়ড বরাদ্দ থাকে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করে। দৈনন্দিন কার্যক্রম মেনে চলার জন্য তাদেরকে একটি তালিকা দেওয়া হয়। এছাড়া স্কুল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান করে থাকে। এতে দেখা যায় ওরা যে কোনো পরিবেশে যে কোনো স্থানে সহজে সবার সাথে মিশতে পারে।

ক. আন্তঃক্রীড়াসূচি কী?

খ. অত্যাবশ্যকীয় কর্মসূচি বলতে কী বোঝায়-ব্যাখ্যা করো।

গ. নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম কাজটি কী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. চারিত্রিক মূল্যবোধের উন্নতি এবং সামাজিক গুণের বিকাশের মাধ্যমেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অর্থেই সামাজিক জীবে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শারীরিক সক্ষমতা

শারীরিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হলো শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করা। তাই শারীরিক সক্ষমতার বৈশিষ্ট্য, খেলাধুলার সাথে এর সম্পর্ক, শারীরিক সক্ষমতার মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা কীভাবে অর্জন করা যায়, লিঙ্গভেদে ব্যায়ামের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারবে। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, দম, গতি, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তার গুরুত্ব এবং কোন খেলায় কোনটির ভূমিকা বেশি তা জানতে পারবে। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে সক্ষম হবে।

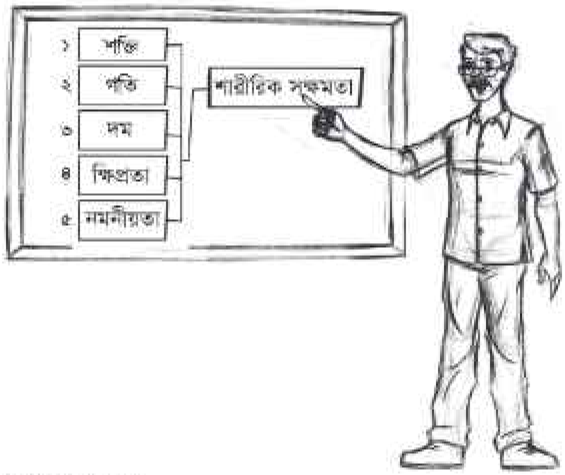

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- দৈহিক সুস্থতার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়ামের ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে বয়স ও লিঙ্গভেদে কোন খেলায় কোন কোন ব্যায়াম উপযোগী তা বর্ণনা ও অনুশীলন করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়াম সঠিক নিয়মে করতে পারব।

পাঠ–১ : শারীরিক সক্ষমতা ও এর গুরুত্ব : সাধারণ অর্থে সক্ষমতা হলো কোনো কাজ করার সামর্থ্য। বৃহত্তর অর্থে সক্ষমতা বলতে জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ধারণ করার সামর্থ্যকে বোঝায়। এর মধ্যে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিকের সামর্থ্য অন্তর্ভুক্ত। তাই মনে করা হয় যে, সক্ষমতা একটি সামগ্রিক ধারণা। সক্ষমব্যক্তি শারীরিক সুস্থতার সাথে সাথে মানসিক সুস্থতা, আবেগীয় ভারসাম্য ও

২০১৫

সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সমর্থ হন। শারীরিক সক্ষমতার এই সামগ্রিক ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য AAHPER (American Associatiion of Health, Physical Education and Recreation) নামক স্পোর্টস জার্নালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক. বংশগতি অনুযায়ী শারীরিক স্বাস্থ্য।

খ. দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং বিপদকালীন অবস্থায় প্রয়োজনীয় শক্তি, দম, সমন্বয় ক্ষমতা ও কৌশল।

গ. প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের প্রতি যথাযথ মনোযোগ ও মূল্যবোধ।

ঘ. আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতা থেকে চাপমুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজন আবেগিক ভারসাম্য।

ঙ. দলের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং সমাজ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক চেতনা।

চ. চলার পথে উদ্ভূত সমস্যাবলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা।

ছ. গণতান্ত্রিক দেশের দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য পালনের জন্য আবশ্যিক নৈতিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা।

সুতরাং সক্ষমতা বলতে ব্যক্তির সামগ্রিক সামর্থ্যকে বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সক্ষমতা মানুষের ব্যক্তি সামগ্রিকতা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সামগ্রিক সক্ষমতার বিভিন্ন দিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাস্তব, প্রয়োজনীয় এবং প্রাথমিক দিক হলো শারীরিক সক্ষমতা। সক্ষমতার এই দিক জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক। শারীরিক সক্ষমতা হলো শারীরিক কাজকর্ম করার সামর্থ্য। সুতরাং দৈহিক কাজের ভিন্নতা অনুসারে শারীরিক সক্ষমতারও স্বরূপ বদলায়। সেজন্য দৈনন্দিন জীবনের হাঁটা, চলা, বসা ও অন্যান্য কাজের জন্য শারীরিক সক্ষমতা এবং একজন খেলোয়াড়ের শারীরিক সক্ষমতা এক নয়। কাজের ধরনের উপর শারীরিক সক্ষমতার ধরনও ভিন্ন। শারীরিক সক্ষমতার সংজ্ঞা হিসেবে ক্লার্ক বলেছেন– ''The ability to carry out everyday task with vigour and alertness, without undue fatigue and with ample energy to enjoy leisure time pursuits and to meet unforeseen emergencies''. ক্লান্ত না হয়ে শক্তি ও সচেতনার সাথে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করা, আনন্দ ও উৎসাহের সাথে অবসর সময় কাটানো এবং সংকট মোকাবিলার সামর্থ্য হলো শারীরিক সক্ষমতা। অনেকের মতে যন্ত্রনির্ভর আধুনিক জীবনে কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাওয়ায় শারীরিক সক্ষমতার উপরোক্ত সংজ্ঞা বর্তমানে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজনীয় দিকগুলো হলো শারীরবৃত্তীয় অঙ্গ ও তন্ত্রসমূহের কার্যক্ষমতা, নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য ইত্যাদি।

শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব : একজন শিক্ষার্থী/ব্যক্তি শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করলে দৈনন্দিন জীবনের সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে। যেমন–

১. যেকোনো শারীরিক কার্যক্রম অনায়াসে করতে পারবে।

২. দৈব-দুর্ঘটনা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।

৩. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৪. শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করলে মন ভালো থাকে ফলে লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারবে।

৫. যেকোনো ধরনের খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারবে।

কাজ–১ : শারীরিক সক্ষমতা বলতে কী বুঝ? তা পোস্টার পেপারে লিখে দেখাও।

কাজ–২ : দলে ভাগ হয়ে শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব আলোচনা করো।

পাঠ–২ : ক্রীড়াভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম : ক্রীড়াভেদে ব্যায়ামের ভিন্নতা রয়েছে। সব খেলার জন্য একই ধরনের ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না। কোনো খেলায় হাতের শক্তির যেমন প্রয়োজন তেমনি কোনো খেলায় পায়ের শক্তির বেশি প্রয়োজন হয়। সংশ্লিষ্ট খেলার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করা হলে ঐ খেলায় ভালো ফল আশা করা যায়। যেমন–

ফুটবল : ফুটবল খেলায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় শক্তি, দম ও ক্ষিপ্রতা। সুতরাং যারা ফুটবল খেলবে তাদেরকে শক্তি ও দম বাড়ানোর ব্যায়াম বেশি করে করতে হবে।

সাঁতার : যারা সাঁতারু তাদের হাত, পায়ের শক্তি ও দম বাড়ানোর ব্যায়াম বেশি করে করতে হবে।

বাস্কেটবল : যে সমস্ত শিক্ষার্থী বা খেলোয়াড় বাস্কেটবল খেলায় অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে দম, ক্ষিপ্রতা ও পায়ের শক্তি বাড়ানোর ব্যায়ামের উপর জোর দিতে হবে।

ভলিবল : ভলিবল খেলোয়াড়দের হাতের শক্তি একটু ভালো হলে স্ম্যাশ করতে সুবিধে হয়। সেজন্য হাতের শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করা উচিত।

হ্যান্ডবল : হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের হাত, পা ও ক্ষিপ্রতার বেশি প্রয়োজন হয়। সেজন্য হাত ও পায়ের শক্তিবৃদ্ধির ব্যায়াম এবং ক্ষিপ্রতা বাড়ানোর ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

কাবাডি : কাবাডি খেলাকে আমরা বলি শক্তির খেলা। শুধু শক্তি হলেই কোনো খেলায় ভালো করা যায় না। কাবাডি খেলায় হাতের শক্তি ও ক্ষিপ্রতার বেশি প্রয়োজন। বয়সানুযায়ী কোন খেলায় কী ধরনের শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন, নিচে একটি ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হলো :

খেলা	দম	ক্ষিপ্রতা	শক্তি			কত বয়স পর্যন্ত
			পা	তলপেট	হাত ও বাহু	
ফুটবল	বে	বে	বে	ম	বে	৩৫ বছর পর্যন্ত
ক্রিকেট	ম	ম	বে	ম	বে	৪০ বছর পর্যন্ত
হ্যান্ডবল	ম	বে	বে	ম	বে	সব বয়সের জন্য
ভলিবল	ক	ম	ম	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
হকি	বে	বে	বে	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
বাস্কেটবল	বে	বে	বে	ক	ক	৩০ বছর পর্যন্ত
সাঁতার	বে	ম	বে	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
স্প্রিন্ট	ম	বে	বে	ম	বে	৪০ বছর পর্যন্ত
দূরপাল্লার দৌড়	বে	ক	বে	ম	ম	৪০ বছর পর্যন্ত
কাবাডি	ম	বে	বে	ম	বে	৩৫ বছর পর্যন্ত
ব্যাডমিন্টন	বে	বে	বে	ম	ম	৪৫ বছর পর্যন্ত

বে= বেশি প্রয়োজন, ম= মধ্যম প্রয়োজন, ক= কম প্রয়োজন

> কাজ–১ : একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের কী ধরনের শারীরিক যোগ্যতা থাকা দরকার তা বলো।
>
> কাজ–২ : একজন স্প্রিন্টার ও একজন দূরপাল্লার দৌড়বিদের শারীরিক যোগ্যতার পার্থক্য লিখে বোর্ডে উপস্থাপন করো।

পাঠ–৩ : বয়স ও লিঙ্গভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম

বয়সভেদে : শারীরিক শিক্ষা সকল বয়সের লোকদের জন্য প্রযোজ্য। তবে বয়সভেদে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম ভিন্নতর হয়ে থাকে। শুধু ব্যায়ামই নয়, খাবার, পছন্দ-অপছন্দ, শারীরিক ক্ষমতা ইত্যাদিও ভিন্নতর হয়। যেমন–শিশুদের শারীরিক সক্ষমতা বড়দের মতো নয়। তাই তাদের সক্ষমতা অর্জনের জন্য 'খেলার ছলে ব্যায়াম' এই কথা মাথায় রেখে ব্যায়াম তথা খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে। যেমন–ব্যাঙের মতো লাফাও, দৌড়ে ঐ দেয়াল ছুঁয়ে আস, কাকের মতো লাফাও বা অন্য কোনো চিত্ত বিনোদনমূলক খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করাতে হবে। কিশোরদের জন্য কিছুটা নিয়মমাফিক ব্যায়াম ও খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে। এক লাইনে দাঁড়ানো, হাত বা পায়ের ব্যায়াম করা, বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা, ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা এই জাতীয় ব্যায়াম বা খেলা নির্বাচন করে শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তবে শিশু ও কিশোরদের ভারোত্তোলন জাতীয় কোনো কঠিন ব্যায়াম করানো যাবে না। এতে শরীরের উন্নতির চেয়ে ক্ষতি হবে। যুবকদের জন্য সময় ও ব্যায়াম নির্বাচন করে নিয়মমাফিক অনুশীলন করাতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলার সঠিক কৌশল জানতে পারবে এবং ভবিষ্যতে খেলাধুলার ভিত গড়ে উঠবে। লক্ষ রাখতে হবে অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে শিক্ষার্থীরা যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। কোনো অঙ্গের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম বাছাই করে অনুশীলন করতে হবে। এভাবে শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করাতে হবে। বয়স্কদের জন্য হালকা ব্যায়াম যেমন–হাঁটা, জগিং, আস্তে আস্তে দৌড়, এভাবে ব্যায়াম নির্বাচন করে শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখতে হবে।

লিঙ্গভেদে : শারীরিক শিক্ষা সকলের জন্য সমান হলেও বাস্তবে কতটুকু তা প্রয়োগ করা যায় এটাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। শারীরিক শিক্ষা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক হলেও শিশু বয়সে ছেলে ও মেয়েদের খেলাধুলা ও ব্যায়াম পৃথক করা যায় না। শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রেও তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শিশুদের জন্য শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম তৈরির ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক খেলাধুলা, অনুকরণমূলক হাঁটা, লাফ ও দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিশুদের শারীরিক গঠন ও শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম তৈরি করা উচিত, যাতে শিশু মনের বিকাশ সাধনও হয়। কিশোর বয়সে অর্থাৎ ৭–১২ বছর বয়সে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। মেয়েরা তখন ভারী কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে না। ছেলেরা দলগত খেলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বেশি তবে ব্যক্তিগত খেলাধুলায় ছেলেমেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন–ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, দৌড় ইত্যাদি। এ সময় থেকেই ছেলেমেয়েদের শারীরিক সক্ষমতার জন্য শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি পৃথক করতে হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ কারণে তাদের কার্যক্রম ভিন্নতর হতে থাকে। ছেলেরা দলগত খেলার সাথে সাথে একক খেলা যথা— অ্যাথলেটিকস, সাঁতার ইত্যাদি খেলা পছন্দ করে। অধিকাংশ ছেলেরা সাহসিকতা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে দ্বিধা করে না। মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের ফলে আচরণে সংকোচ ও লজ্জাভাব দেখা যায়। সেজন্য শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম আলাদা হয়ে থাকে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিযোগিতা হয় যেমন—সাঁতার, অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস প্রভৃতি ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে করা হয়। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শারীরিক শক্তি ও

সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকায় শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম ভিন্ন হয়। সুতরাং লিঙ্গভেদে শিশু পর্যায়ে পার্থক্য করা না গেলেও বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

> কাজ–১ : বয়সভেদে শিশু ও কিশোরদের শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
>
> কাজ–২ : বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম কেন পৃথক করা হয়–উপস্থান করো।

পাঠ–৪ : শারীরিক সক্ষমতায় ব্যায়ামের প্রভাব : শারীরিক সক্ষমতার জন্য ব্যায়াম অপরিহার্য। ব্যায়াম না করলে কখনো শারীরিক সক্ষমতা অর্জন সম্ভব নয়। সেজন্য সব বয়সের মানুষের নিয়ম মোতাবেক নির্দিষ্ট ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ব্যায়ামের প্রভাবে শরীরের ভিতর বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয় যা শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ব্যায়ামের প্রভাবে শরীরের ভিতর যে পরিবর্তন হয় তা এখানে তুলে ধরা হলো–

১. হৃৎপিন্ডের (Heart) পেশি শক্তিশালী হয় : খেলাধুলা বা ব্যায়াম করলে শরীরের রক্ত চলাচল বেড়ে যায় ফলে হৃৎপিন্ডের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে হৃৎপিন্ডের পেশি শক্তিশালী ও নীরোগ হয়। এরূপ হৃৎপিন্ডকে "অ্যাথলেটিক হার্ট" বলে।

২. হৃৎপিন্ডে রক্ত সঞ্চালন করার ক্ষমতা বাড়ে : একজন সাধারণ মানুষের হৃৎপিন্ড প্রতি মিনিট ১৩০ মিলিলিটার রক্ত সঞ্চালন করে। খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার সময় রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হৃৎপিন্ডের সঞ্চালন করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে হৃৎপিন্ড সবল ও কর্মক্ষম হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩. পাল্স রেট (Pulse rate) বৃদ্ধি পায় : একজন সাধারণ মানুষ পরিশ্রম করলে তার পালস রেট বেড়ে যায়। পুনরায় স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগে। ফলে ক্লান্তি সহজে দূর হয় না। অপরদিকে একজন ভালো খেলোয়াড় যখন খেলাধুলা বা ব্যায়াম করে তখন তার পালস রেট বেশি বাড়ে না এবং দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে। ফলে তার ক্লান্তি তাড়াতাড়ি দূর হয়।

৪. রক্ত চলাচল বাড়ে : খেলাধুলা বা ব্যায়াম করলে শরীরের রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের চেয়ে খেলোয়াড়দের মাংসপেশি, হৃৎপিন্ড ইত্যাদির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও সবল হয়।

৫. রক্ত কণিকা : রক্ত কণিকা তিন ধরনের থাকে–

ক. লোহিত কণিকা খ. শ্বেত কণিকা গ. অণুচক্রিকা

ক. **লোহিত কণিকা :** রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকে। এক ঘন মিলিলিটার রক্তে পুরুষদের রক্তের ক্ষেত্রে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ এবং মহিলাদের রক্তে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোহিত কণিকা থাকে। এটি অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন হয় ও ১২০ দিন পর প্লীহায় বিনষ্ট হয়। ব্যায়াম করলে লোহিত কণিকার সংখ্যাও বেড়ে যায় ও বেশি দিন বাঁচে। এটি হিমোগ্লোবিনের সহায়তায় দেহের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. **শ্বেত কণিকা :** আমাদের শরীরে রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা অনেক কম থাকে। এক মিলিলিটার রক্তে ছয় থেকে আট হাজার শ্বেত কণিকা থাকে। এরা বর্ণহীন ও নিউক্লিয়াসযুক্ত। এরা সাধারণত ১২–১৩ দিন বেঁচে থাকে। ব্যায়াম করলে এরা বেশিদিন বাঁচে ও সংখ্যা বেড়ে যায়। শ্বেতকণিকা রক্তে প্রবেশকারী জীবাণুকে ঘিরে ধরে বিনষ্ট করে এবং দেহকে রক্ষা করে। ফলে শারীরিক সক্ষমতা মজবুত ও শক্তিশালী হয়।

গ. **অণুচক্রিকা :** অণুচক্রিকা দেখতে ডিম্বাকার ও বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট অনেকটা ডিসকের মতো দেখতে। দেহের বৃহদাকার কোষ ভেঙ্গে অণুচক্রিকা সৃষ্টি হয়। দেহের কোনো স্থানে ক্ষত হলে সেখানে ৩ মিনিটের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

৬. শ্বাসপ্রশ্বাস (Respiration) : খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার সময় ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করতে হয়। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ ও প্রশ্বাসের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায়। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসের ফলে বুকের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শারীরিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

৭. মাংসপেশি (Muscle) : শরীরে বিভিন্ন ধরনের মাংসপেশি থাকে। খেলাধুলা ও ব্যায়ামের ফলে মাংসপেশি সংখ্যায় বাড়ে না তবে আকৃতিতে বড় হয়, টিস্যুগুলো মোটা ও শক্তিশালী হয়। ফলে শারীরিক সক্ষমতাও অনেক বেড়ে যায়। ব্যায়ামের ফলে শরীরের মাংসপেশিতে যে বিভিন্ন পরিবর্তন বা বৃদ্ধি ঘটে তা শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে।

কাজ–১ : ব্যায়ামের ফলে হৃৎপিন্ডের যে পরিবর্তন ঘটে তা পোস্টার পেপারে লিখে দেয়ালে লাগাও।

কাজ–২ : ব্যায়ামের ফলে রক্তে লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকার কী পরিবর্তন হয় তা বিশ্লেষণ করো।

পাঠ–৫ : শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে গতি, শক্তি, দম, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়াম : ব্যায়াম করার আগে প্রত্যেকের নিজ দেহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে এই জ্ঞান আরও জরুরি। প্রত্যেকেরই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলে অঙ্গের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম বেছে অনুশীলন করা যায়। মাংসপেশির গতি সঞ্চালনের জন্য পাঁচ ধরনের শারীরিক সক্ষমতার দ্বারা শরীরকে উপযুক্ত করে গঠন করা যায়। যেমন–

১. শক্তি ২. গতি ৩. দম ৪. ক্ষিপ্রতা ৫. নমনীয়তা

১. শক্তি (Strength) : শক্তি বলতে হাতের মাংসপেশির উন্নতির মাধ্যমে হাতের শক্তি বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। নিচে হাতের শক্তি বৃদ্ধি করার কয়েকটি ব্যায়াম উল্লেখ করা হলো–

ক. ডাম্বেল হাত দিয়ে ধরে উপরে উঠানো ও নামানো।

খ. চিত হয়ে শুয়ে ভার উপরে তোলা ও নামানো।

গ. মাটিতে দু হাত কাঁধ বরাবর ফাঁক রেখে পুশ আপ। আস্তে আস্তে এক পা উপরের দিকে তুলে পুশ আপ।

ঘ. মেডিসিন বল ছোড়া।

ঙ. মাল্টি জিমে বিভিন্ন প্রকার হাতের ব্যায়াম করা।

উল্লিখিত ব্যায়ামগুলো প্রশিক্ষকের নির্দেশে নিয়ম মাফিক করলে হাত ও কাঁধের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

২. গতি (Speed) : গতি বলতে দ্রুততা বোঝায়। যে যত বেশি দ্রুততার সাথে যেতে পারে তার গতি বেশি বলে ধরা হয়। গতি বৃদ্ধির জন্য পায়ের মাংসপেশির শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করা প্রয়োজন। যেমন–

ক. চিত হয়ে শুয়ে পায়ের পাতার উপর ভার নিয়ে পা উপরে উঠানামা করাতে হবে।

খ. জিমনেশিয়ামে পা দ্বারা লোহার ভারকে ঠেলে ভিতরে ও বাইরে নিতে হবে।

গ. ২৫ মিটার, ৫০ মিটার দৌড় বারবার অনুশীলন করতে হবে।

ঘ. ট্রেডমিলের উপর দাঁড়িয়ে দৌড় অনুশীলন করতে হবে।

ঙ. বালির মধ্যে কিছুক্ষণ দৌড়ালেও মাংসপেশি সবল হয়।

এভাবে অনুশীলন করলে পায়ের মাংসপেশি সবল ও বৃদ্ধি পায়। ফলে তার গতি বৃদ্ধি পাবে।

৩. দম (Stamina) : সব খেলার জন্য দম প্রয়োজন। তবে ফুটবল, লম্বা দূরত্বের দৌড়, ম্যারাথন, বাস্কেটবল এ খেলাগুলোতে দম সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। দম বাড়ানোর ব্যায়াম হলো–

ক. আস্তে আস্তে দৌড়, তবে বেশি সময় ধরে দৌড়াতে হবে।

খ. উঁচু-নিচু জায়গা দিয়ে বা অসমতল জায়গা দিয়ে দৌড়াতে হবে।

গ. প্রথম দিন ১ কিলোমিটার, ৩ দিন পর ১ $\frac{১}{২}$ কিলোমিটার, তার ৭ দিন পর ২ কিলোমিটার, এভাবে দূরত্ব বাড়িয়ে দৌড়াতে হবে।

৪. ক্ষিপ্রতা (Agility) : শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে অল্প জায়গার মধ্যে কে কত দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারে তাকেই ক্ষিপ্রতা বলে।

ক. দ্রুত দৌড়ে যাওয়া ও বাঁশির সংকেতে থামা।

খ. ১০ মিটার দৌড় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে দৌড় দিয়ে দাগ ছুঁয়ে আসা ও যাওয়া। এভাবে সময় ধরে দৌড় অনুশীলন করতে হবে।

গ. ২০ মিটার দৌড়ের জন্য দুই মিনিট সময় নির্ধারণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে কে কতবার দৌড়াতে পারে তা জেনে যে ভালো করেছে সে বিজয়ী হবে। এভাবে পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৫. নমনীয়তা (Flexibility) : শরীরের নমনীয়তা বৃদ্ধি করার জন্য এই শারীরিক ব্যায়ামগুলো করতে হবে, যেমন–

ক. একটি উঁচু বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে পা সোজা রেখে শরীর বাঁকিয়ে দু হাত কানের সাথে রেখে আস্তে আস্তে সামনের দিকে শরীর বাঁকাতে হবে। যার শরীর যত বেশি বাঁকা হবে তার নমনীয়তা তত বেশি।

খ. চিত হয়ে শুয়ে দুই কানের কাছে দুই হাত রেখে হাঁটু ভাঁজ করে শরীর উপরের দিকে তোলা ও নামানো। একে আর্চিং বলা হয়।

গ. মাটিতে বসে দু পা সামনে সোজা করে রেখে দু হাত কানের সাথে লাগিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করা।

কোনো শিক্ষার্থী যদি এই ৫টি গুণ অর্জন করতে পারে তাহলে তার শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, কাজে-কর্মে উৎসাহ ও পড়াশোনায় মন বসবে।

কাজ–১ : শক্তি বাড়ানোর ব্যায়ামগুলো পোস্টার পেপারে লিখে টাঙিয়ে দাও।

কাজ–২ : দম বাড়ানোর ব্যায়ামগুলো ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লিখে ব্যাখ্যা করো।

অনুশীলনী

১. লোহিত কণিকা কোথায় উৎপন্ন হয়?

ক. প্লীহায় খ. যকৃতে

গ. অস্থিমজ্জায় ঘ. ফুসফুসে

২. দম, ক্ষিপ্রতা কোন খেলায় বেশি দরকার?

ক. ক্রিকেট খ. ভলিবল

গ. ফুটবল ঘ. হ্যান্ডবল

৩. আমাদের শরীরে বারবার শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করলে নিম্নের কোনটি ঘটে?

ক. শরীর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হয় খ. রক্তে জীবাণু বিনষ্ট হয়

গ. লোহিত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায় ঘ. দেহের বৃহদাকার কোষ ভেঙে যায়

নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

ক্রমিক	ক	খ	গ
১	৩ মিনিটের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে	১২০ দিন পর প্লীহায় বিনষ্ট হয়	১১ থেকে ১৩ দিন বাঁচে
২	ডিম্বাকার	অক্সিজেন পরিবহণ	শত্রুকে বিনষ্ট করে

৪. 'ক' কলাম কীসের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে?

ক. লোহিত কণিকা খ. শ্বেত কণিকা

গ. অণুচক্রিকা ঘ. রক্তরস

৫. উপরের সারিতে 'খ' ও 'গ'-এর মধ্যে অমিলগুলো হলো—

i. বর্ণ বৈচিত্র্য

ii. নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি

iii. আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পর্যবেক্ষণ করো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৬ বছরের বালক রূপম

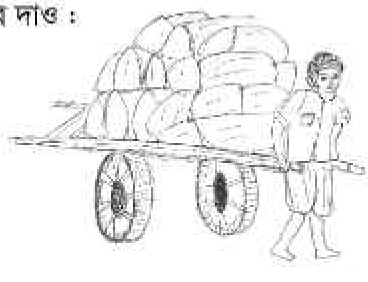

১৬ বছরের বালক সোহেল

চিত্রের মাধ্যমে জানা যায়, রূপমের পালস রেট স্বাভাবিক থাকলেও সোহেলের পালস রেট অস্বাভাবিক বেশি।

৬. রূপমের পালস রেট স্বাভাবিক থাকার কারণ কী?

ক. বয়স কম　　খ. লেখাপড়া করা

গ. পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ　　ঘ. খেলাধুলা করা

৭. দু জনেই পরিশ্রম করা সত্ত্বেও সোহেল বেশি ক্লান্ত হয় কেন?

ক. সোহেলের রক্তে অণুচক্রিকা বৃদ্ধি পায়　　খ. সোহেলের রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমে যায়

গ. সোহেলের রক্তে অণুচক্রিকা স্থিতিশীল থাকে　　ঘ. শ্বেতকণিকা নিষ্ক্রিয় থাকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৯ম শ্রেণির আবির ও আরিফ দুই বন্ধু কাবাডি ও বাস্কেটবল খেলায় অংশগ্রহণ করে। আবির কাবাডিতে ভালো করলেও হাতের শক্তি কম থাকায় বাস্কেটবল খেলায় ভালো করতে পারেনি। অন্যদিকে আরিফ কাবাডি ও বাস্কেটবল উভয় খেলাতেই ভালো নৈপণ্য প্রদর্শন করে।

ক. শক্তি কী?

খ. বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম আলাদা কেন? বর্ণনা করো।

গ. আবির কীভাবে বাস্কেটবল খেলায় ভালো করতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আবিরের হাতের শক্তির জোর বাড়ালেই কি সে আরিফের মতো বাস্কেটবল খেলায় ভালো করতে পারবে? বিশ্লেষণ করো।

২০১৫

তৃতীয় অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য ও অবসাদ

মানসিক স্বাস্থ্য ও অবসাদ সম্পর্কে আলোচনার আগে স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি তা জানা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক সুস্থতা বা শরীরের নীরোগ অবস্থাকে বুঝি। ব্যাপক অর্থে শারীরিক সুস্থতার সাথে মানসিক সুস্থতারও প্রয়োজন। মানসিক সুস্থতা শারীরিক সুস্থতার উপর নির্ভরশীল। যেকোনো কাজে আমরা নিযুক্ত থাকি না কেন শরীর সুস্থ না থাকলে কিছুই ভালো লাগে না, কাজে উৎসাহ থাকে না, কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি নিজের চাহিদা ও পরিবেশের সাথে সফলভাবে সঙ্গতি বিধান করতে পারে, সেই মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ। একজন মানুষের ব্যক্তিসত্তার সাথে সামঞ্জস্যমূলক শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াকলাপের ঐ ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। অতিরিক্ত কাজ বা পরিশ্রমের চাপে একজন সাধারণ মানুষ বা একজন খেলোয়াড়ের কর্মক্ষমতা সাময়িকভাবে হ্রাস পায়। আবার দীর্ঘক্ষণ একই কাজ করার ফলে সেই কাজের প্রতি মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে ব্যক্তির কর্মক্ষমতার অবনতি হয়। ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এই পরিবর্তনকেই ক্লান্তি বা অবসাদ বলা হয়।

মানসিকভাবে সুস্থ ছেলেমেয়ে   অবসাদগ্রস্ত ছেলেমেয়ে

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানসিক আচরণের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- অবস্থাভেদে মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানসিক অস্থিরতা দূর করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবসাদের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবসাদগ্রস্ত হওয়ার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবসাদ দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- অবসাদগ্রস্ততা দূর করে সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে পারব।

পাঠ–১ : মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার্থীর জীবনে এর ভূমিকা—এই অধ্যায়ের শুরুতেই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানসিক স্বাস্থ্য বলতে– "Full and harmonious functioning of the whole personality"-কে বোঝায়। খেলাধুলা যেমন আমাদের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখে, তেমনিভাবে মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের দেহ ও মনের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। দেহের কোনো অঙ্গের ক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে যেমন দৈহিক অসুস্থতা দেখা দেয়, তেমনি মানসিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জীবনে প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই মানসিক অসুস্থতা প্রত্যক্ষ করা যায়। খেলাধুলা শুধু শারীরিক কসরত নয়, এর সাথে জয়ের আনন্দ ও পরাজয়ের বেদনাও জড়িত থাকে। তবে যেহেতু একজন ক্রীড়াবিদ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, সেজন্য তাকে মানসিকভাবেও সুস্থ থাকতে হয়। কারণ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা একে অপরের পরিপূরক। একজন শিক্ষার্থী কোনো খেলায় জয়লাভ করলে আনন্দিত হয়, পরবর্তীকালে আরও ভালো করার জন্য তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে। আর তার এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য সে প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহী হয়ে বেশি বেশি সময় ব্যয় করে এবং পরিশ্রমী হয়। তবে এরূপ জয়ের ফলে তার মধ্যে নেতিবাচক মনোভাবও গড়ে উঠতে পারে। যেমন–প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, নিজকে বড় করে দেখা কিংবা অপরের দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং বিজয়ী খেলোয়াড়দের মানসিকতার ভালো বা খারাপ দু ধরনের ফলাফল আসতে পারে।

আবার পরাজিত হলে হতাশার সৃষ্টি, অন্যের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করতে পারে। অনেকে হতাশায় মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে খেলাধুলা ছেড়ে দিতে পারে। জয়-পরাজয়ের এই স্বাভাবিক ঘটনাকে সহজভাবে নিতে না পারলে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং তার কর্মকাণ্ডে নানা রকম অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ক্রীড়া শিক্ষক বা প্রশিক্ষকদের বিজয়ী বা বিজিত খেলোয়াড়দের সাথে একত্রে কাজ করে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন।

কাজ–১ : শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলে তা মনের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে একটি দল ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লেখো।এবং দৈহিক অসুস্থতার কারণে মন ভালো থাকে না এর কারণগুলো আরেকটি দল বোর্ডে লেখো। অতঃপর আলোচনা করো।

কাজ–২ : খেলাধুলায় জয়ী বা পরাজিত হলে একজন খেলোয়াড়ের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় এবং কীভাবে তা একজন ক্রীড়াবিদকে প্রভাবিত করে–শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

পাঠ–২ : মানসিক আচরণ, এর প্রকারভেদ এবং মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের উপায়—মানুষ জীবতাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এই ধাপগুলো হচ্ছে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব। প্রতিটি ধাপে শারীরিক পরিবর্তনকালে প্রতিটি মানুষ একটি সুনির্দিষ্ট আচরণের ধরন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ ধরনের আচরণ ভৌত এবং রাসায়নিক উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া তাৎক্ষণিক

প্রতিক্রিয়া (Reflex action), সহজাত প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত বা উদ্দীপিত হয়। অতঃপর জীবন যখন এগিয়ে চলে তখন আচরণের ধরনে জটিলতা দেখা দেয় এবং প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা এ সকল জটিলতা মানুষ তার স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও অভীষ্ট সাধনের ক্ষমতা দ্বারা সমাধান করতে সক্ষম হয়।

মানসিক আচরণের প্রকারভেদ : মানব প্রকৃতি বিশদভাবে জানতে গেলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় এজন্য যে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্য পরিদৃশ্যমান। যেমন কেউ অতিমাত্রায় ফূর্তিবাজ আবার কেউ বিষাদগ্রস্ত, কেউ কৌতুকপ্রিয়, কেউ রাশভারী, কেউ প্রাণবন্ত, কেউ গম্ভীর, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা, কেউ সতর্ক, কেউ দুঃসাহসী, কেউ অমায়িক, স্নেহপ্রবণ, কোমল, কেউ অমার্জিত রূঢ়, কঠোর—এভাবে দু'টি পরস্পরবিরোধী আচরণের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় এবং তা খুবই বৈচিত্র্যময়। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যখন এসব বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় তখন আমরা তাকে ব্যক্তিস্বতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নামে অভিহিত করি। আর এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একজন ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তি থেকে আলাদা করা যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই বিভিন্নতার কারণ কী তা জানা প্রয়োজন। কেননা একই পরিবারের একই পরিবেশে সব সন্তান একই রকমের হয় না। তাদের আচরণের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ এজন্য শারীরিক গঠন কাঠামোকে দায়ী করেন। আবার কেউ বংশগতি কিংবা পরিবেশগত অবস্থাকে এর কারণ বলে মনে করেন।

মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের উপায় : স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে বোঝায়। শরীর ও মন একে অপরের পরিপূরক। মানসিক অশান্তি থাকলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানসিক অসুস্থতা মানুষের জীবনে অনেক ব্যর্থতা ও দুর্গতির সৃষ্টি করতে পারে। মানসিক অসুস্থতার কারণে শিশু মনে মানসিক বিকৃতির সূত্রপাত হয়, মাতা-পিতা বা অভিভাবক এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে শিশু প্রকৃতির যেকোনো অস্বাভাবিকতা দূর করতে যত্নবান হবেন।

মানসিক অবস্থা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিষয়। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে মনস্তত্ত্ব, মানসিক ব্যাধি, ভেষজ, প্রাণিবিদ্যা, সমাজ বিস্তার। শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিভিন্ন রকমের মানসিক বিকৃতি তথা অস্থিরতা, মানসিক বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করে। মানসিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানসিক ব্যাধি, বুদ্ধিবৃত্তির স্বল্পতা, স্নায়বিক মনোবিকার, অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি প্রধান। মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের তথা প্রতিরোধের জন্য সুশিক্ষা, শিশুর স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন, পরিচর্যা, উন্নত পারিবারিক পরিবেশ, মাতা-পিতা, অভিভাবকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির প্রয়োজন। মানসিক আচরণের এই জটিল গতি প্রকৃতি ও অস্থিরতা দূরীকরণে ধৈর্যশীল আচরণ, সুশিক্ষা, শিশুবান্ধব পরিবেশ, পুষ্টি, পরিচর্যা, আনন্দময় জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর সরবরাহ ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে আগামীতে এক সুস্থ জাতি গড়ে উঠবে যা সামগ্রিকভাবে সকলের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

কাজ–১ : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে পরস্পরবিরোধী আচরণ দেখতে পাওয়া যায় তা উল্লেখ করে শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো এবং যুক্তি প্রদর্শন করো।

কাজ–২ : মানসিক অস্থিরতার ক্ষতিকারক দিক কী এবং মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো।

পাঠ–৩ : অবসাদ, শ্রেণিবিভাগ ও শিক্ষার্থীর উপর এর প্রভাব—দীর্ঘক্ষণ একই কাজ করার ফলে সেই কাজের প্রতি মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এ পরিবর্তনকেই ক্লান্তি বা অবসাদ বলা হয়। তাই অবসাদ বলতে কর্মশক্তির শিথিলতা বা কর্মশক্তির হ্রাস পাওয়াকে বোঝায়। কর্মক্ষমতা হ্রাসই হলো অবসাদের সর্বজনীন কারণ। মনোবিদগণ অবসাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন—'কর্মক্ষমতা হ্রাসই হলো অবসাদ।' কারোর মতে—'কাজ করার জন্য কর্মক্ষমতার হ্রাসই হলো অবসাদ, তবে বিশ্লেষণধর্মী সংজ্ঞা হলো—'এক নাগাড়ে কোনো কাজ করার দরুন শরীরে কর্মক্ষমতার যে অবনতি হয় তাকে অবসাদ বলা যেতে পারে।'

অবসাদের শ্রেণিবিভাগ : মনোবিদগণ অবসাদকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন– (ক) দৈহিক অবসাদ ও (খ) মানসিক অবসাদ।

ক. দৈহিক অবসাদ : খুব বেশি সময় ধরে দৈহিক পরিশ্রম করলে যে অবসাদ আসে তাকে দৈহিক অবসাদ বলে। এ অবসাদ দৈহিক পেশিঘটিত ও ইন্দ্রিয়গত। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক শ্রমের একটি সীমা আছে, এ সীমা অতিক্রম করলে অবসাদ দেখা দেয়। সাধারণ অবস্থায় কাজের সময় যেসব শারীরিক চাহিদা অনুভূত হয় তা দেহ নিজেই পূরণ করে নেয়। যেমন–দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার ফলে অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা মেটানো যায়। আবার রক্তের চাপ ও হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলে অতিরিক্ত শর্করা নিঃসৃত হয়। তবে কাজটি বেশি শ্রমসাধ্য হলে, ব্যক্তির সহনশীলতা কম হলে, অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরমে ব্যক্তির শারীরিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে অবসাদ দেখা দেয়।

খ. মানসিক অবসাদ : মানসিক কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে থাকলে মানসিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অবসাদ দেখা দেয়। যেমন—অনেক সময় ধরে এক নাগাড়ে অঙ্ক করতে থাকলে একটা পর্যায়ে অঙ্ক করার জন্য বিচারশক্তি, চিন্তাশক্তি ও নির্ভুল করার ক্ষমতা কমতে থাকে। এই কমতে থাকা অর্থাৎ পরিবর্তনের এই অবস্থাকে মানসিক অবসাদ বলে। এছাড়া ব্যক্তিগত পছন্দ, অপছন্দ, মানসিক অবস্থার তারতম্য, পরিবেশগত কারণেও অবসাদ আসতে পারে। তবে দৈহিক ও মানসিক কাজকে যেমন সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না, তেমনি দৈহিক অবসাদ ও মানসিক অবসাদকে আলাদা করা যায় না। অনেকক্ষণ দৈহিক পরিশ্রম করলে মানসিক অবসাদ আসতে পারে, তেমনি একটানা মানসিক কাজ করতে থাকলে দৈহিক অবসাদ আসে।

শিক্ষার্থীর উপর মানসিক অবসাদের প্রভাব : শিক্ষার্থী বলতে এখানে শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের বোঝানো হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের যে দৈহিক অবসাদ আসে তা তাদের শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাদের শারীরিক পরিশ্রমের ফলে বিপুল পরিমাণ ঘাম নিঃসরণ, শারীরিক অঙ্গ-সঞ্চালন এবং একাগ্রতার উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু যখন তারা মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন যেসব প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ :

১। তাদের কর্মসূচি পালনকালে ভুল হতে থাকে।

২। তারা নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।

৩। তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকে না।

৪। তারা কাজের ছন্দ হারিয়ে ফেলে এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেয়।

৫। তারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে, কর্মসূচি বাস্তবায়নের কলাকৌশল সহজে বুঝতে পারে না।

৬। কাজের একাগ্রতা কমে যায় এবং তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

কাজ–১ : অবসাদ কী এবং কী কারণে অবসাদের সৃষ্টি হয় তা শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বোর্ডে লেখ এবং আলোচনা করো।

কাজ–২ : মানসিক অবসাদগ্রস্ত হলে মনের উপর যেসব প্রভাব পড়ে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো।

পাঠ–৪ : মানসিক অবসাদের কারণ ও তা দূরীকরণের উপায় : দৈহিক বা মানসিক অবসাদ, সামগ্রিক বা আংশিক যাই হোক না কেন তার পিছনে কতকগুলো কারণ রয়েছে। ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিজনিত শারীরিক চাপের কারণে সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে অবসাদ আসে। তবে আরও অনেক কারণে অবসাদ আসতে পারে। মনোবিদগণ অবসাদের কারণসমূহকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন– (১) দৈহিক কারণ, (২) মানসিক কারণ এবং (৩) পরিবেশগত কারণ। দৈহিক অবসাদের জন্য মাংসপেশিতে ল্যাকটিক এসিডের সৃষ্টি, দেহকোষের ক্ষয়, শরীর থেকে লবণ বের হয়ে যাওয়া, যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন ঘাটতি, অতিরিক্ত অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি কারণে হয়ে থাকে। এই পাঠে আমরা মানসিক অবসাদ নিয়ে আলোচনা করব। মানসিক অবসাদের কারণসমূহকে আমরা নিম্নবর্ণিত উপায়ে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন–

১। মানসিক প্রস্তুতির অভাব : কোনো কাজ করার আগে সে সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কর্মসূচি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা স্পষ্ট না থাকলে তাড়াতাড়ি মানসিক অবসাদ আসে।

২। কাজে অভ্যস্ত না হয়ে উঠা : কর্মসূচি নিয়মিতভাবে পালনকালে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে ঐ কর্মসূচিতে তাড়াতাড়ি অবসাদ আসে না। তাই অভ্যাসের অভাবের কারণে অনেক সময় অবসাদ দেখা দেয়।

৩। কর্মক্ষেত্রে প্রেষণা এবং কাজের প্রতি অনুরাগের অভাব : যেকোনো কাজের পিছনে প্রেষণা থাকলে একটানা কাজ করেও অনেক সময় অবসাদ আসে না। আবার যে কাজে প্রেষণা নেই, সেই কাজ তার কাছে বোঝাস্বরূপ। ঐ ধরনের চাপিয়ে দেওয়া কাজে সহজে মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

৪। মানসিক ইচ্ছার অভাব : কর্মসূচি বাস্তবায়নের শিক্ষার্থীর যদি অনীহা থাকে তাহলে সে দ্রুতই মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানসিক ইচ্ছা প্রবল হলে অনেক সময় কঠিন কাজ হলেও তা করা সম্ভব হয়। তাই মানসিক ইচ্ছার অভাব অবসাদের একটি বিশেষ কারণ।

৫। পরিবেশগত কারণ : দৈহিক ও মানসিক কারণ ছাড়াও কিছু পরিবেশগত কারণেও অবসাদ আসতে পারে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অর্থাৎ স্যাঁতসেঁতে, আলো-বাতাসের অভাব এমন পরিবেশ, খুব গরম, খুব ঠান্ডা বা গুমোট আবহাওয়া কোনো কাজের জন্য অনুকূল পরিবেশ নয়। এরূপ পরিবেশে সহজেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। অনুরূপভাবে পরিমিত আলো, বাতাস, প্রশস্ত জায়গা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ না থাকলে অল্পতেই অবসাদ এসে ভর করে।

মানসিক অবসাদ দূরীকরণের উপায় : দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়ের ফলেই যেহেতু অবসাদের উদ্ভব হয়, তাই দেহ ও মনের সুস্থতা ও সক্রিয়তা আনয়নের মাধ্যমে অবসাদ দূর করা সম্ভব। মানসিক অবসাদ দূরীকরণের জন্য আমরা নিচের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করতে পারি :

১। কর্মসূচির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি : শিক্ষার্থীর যদি কর্মসূচির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি অবসাদ আসে না।

২। কর্মসূচির একঘেয়েমিতা পরিহার : বিরক্তিকর কর্মসূচির একঘেয়েমিতা শিক্ষার্থীকে অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। অন্যদিকে কাজের ফাঁকে বিশ্রাম কর্মসূচিকে আনন্দপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় করলে অবসাদ দূর করা যায়।

৩। প্রেষণা : কর্মসূচিতে প্রেষণা থাকলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে তা পালন করবে এবং শীঘ্র অবসাদ আসবে না।

৪। অতিরিক্ত চাপযুক্ত কর্মসূচি পরিহার : সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে চাপ দেওয়া যাবে না।

৫। বিশ্রাম ও ঘুম : দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন। তেমনি অবসাদ দূর করার জন্য প্রয়োজন পরিমিত বিশ্রাম ও ঘুম। বিশ্রাম ও ঘুমের ফলে দেহ ও মস্তিষ্কের অবসাদ দূরীভূত হয় এবং পুনরায় নতুন উদ্যোগে কাজ করার স্পৃহা জন্মে।

কাজ–১ : মানসিক অবসাদের কারণসমূহের একটি তালিকা বাড়ির কাজ হিসেবে তৈরি করে এনে শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে লেখো এবং দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো।

কাজ–২ : মানসিক অবসাদ দূরীকরণের উপায়গুলো ধারাবাহিক লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো। শিক্ষার্থীরা এর উপর আলোচনা করো।

অনুশীলনী

১. অবসাদ কী?

ক. কর্মশক্তি হ্রাস
খ. শারীরিক দুর্বলতা
গ. কাজের প্রতি অনীহা
ঘ. স্নায়ুবিক দুর্বলতা

২. খেলায় পরাজয় সহজভাবে মেনে নিতে না পারলে–

i. মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়
ii. কর্মকাণ্ডে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়
iii. নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শামীম ৮ম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা-মা দুজনেই চাকুরীজীবি। শামীমের বাড়ির পাশে মাঠ না থাকায় সে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে না। যতক্ষণ পারে পড়াশোনা করে। বাকি সময় ঘরে একা বসে থাকে। এতে কিছুদিন পর সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

৩. শামীমের অসুস্থতার ধরনটি কী?

ক. দৈহিক
খ. মানসিক
গ. পারিবারিক
ঘ. সামাজিক

৪. শামীমের বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হচ্ছে–

i. বিনোদনের ব্যবস্থা
ii. বন্ধুদের সাহচর্য
iii. খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর নবম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী রিতুর উপর একমাত্র ভাইয়ের পড়ালেখার ও মায়ের চিকিৎসাসহ সংসারের সকল খরচ পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে। ফলে সকাল বিকাল টিউশনি করে এবং বাসায় থেকে রাত জেগে দর্জির দোকানের কাপড় সেলাই করে সে অর্থ উপার্জন করে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় তার ফলাফল খারাপ হলে তার মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। এতে সে পড়ালেখা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার মা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাকে উৎসাহিত করায় সে আবার পড়ালেখায় ফিরে আসে।

ক. প্রেষণা কী?

খ. শিশুমনে অস্বাভাবিকতার কারণ কী?

গ. রিতুর পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রিতুর মানসিক অবস্থা দূরীকরণে কোন বিষয়টি কাজ করেছে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ উপস্থাপন করো।

২. নিলীমা সারাদিন অঙ্কক করে। তার মা তাকে বাইরে ঘুরে আসতে বললেও সে যায় না। সন্ধ্যার দিকে নিলীমা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যে অংক দিনে অল্প সময়ের মধ্যে করতে পেরেছিল, এখন সেটা করতে বেশি সময় লাগছে। এ বিষয়টি নিয়ে নিলিমা চিন্তিত। তার মা তাকে টেলিভিশন দেখতে বলে এবং কিছু সময় বিশ্রাম নিতে বলে।

ক. মানসিক অবসাদ কী?

খ. শরীর ও মন একে অপরের পরিপুরক–ব্যাখ্যা করো।

গ. নিলীমার রাতে অঙ্কক করতে দেরি হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. নিলীমার এ অবস্থা থেকে উত্তরণে তার মায়ের কর্মকাণ্ডের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

২০১৫

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসেবা

ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে বেঁচে থাকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়সমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলা হয়। এখন স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি তা প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা একটা বিখ্যাত উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করতে পারি। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্লেটোস রিপাবলিক'-এর ৪র্থ অধ্যায়ে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন– ''Now to produce health is to part the various parts of the body in their natural relations of authority or subservience to one another, whilst to produce disease is to disturb this natural relation.'' এই সংজ্ঞার সরল অর্থ করলে দাঁড়ায় ''এখন স্বাস্থ্য অর্জন করার অর্থ হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একে অপরের উপর কর্তৃত্ব অথবা অধীনতার স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনকে নির্দিষ্ট করা। পক্ষান্তরে, শরীরে রোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক আন্তঃসম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হওয়াকে বোঝায়। উপরোক্ত সংজ্ঞাকে সহজ করলে আমরা স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক সুস্থতা অর্থাৎ শরীরের সুস্থ অবস্থাকে বুঝি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে কেবল শারীরিক সুস্থতাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, শরীরের সাথে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে মানসিক সুস্থতাও প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের ন্যায় মূল্যবান সম্পদ লাভ করতে হলে আমাদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আমাদের সুস্থ থাকার উপায় সম্পর্কে যেমন ধারণা দেয় তেমনি রোগগ্রস্ত হলে তা থেকে পরিত্রাণ লাভের পন্থাও জানিয়ে দেয় অর্থাৎ স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। তাই সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করে ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যরক্ষায় সচেতন হওয়া, বিদ্যালয় ও গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলা, পুষ্টির অভাব পূরণে বিদ্যালয়ে টিফিন প্রোগ্রাম চালু করা, বিদ্যালয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবামূলক কর্মসূচি পালন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

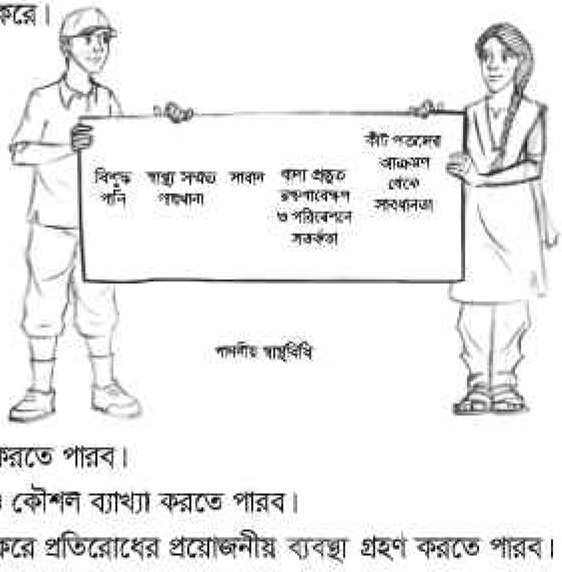

পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার ধারণা ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যা চিহ্নিত করে প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব।
- স্বাস্থ্যসেবার আওতা/পরিধি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- টিফিন প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- স্বাস্থ্যকার্ড সম্বন্ধে ধারণা পাব এবং এর উপকারিতা ব্যাখ্যা করে রোগ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারব।

পাঠ–১ : স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও এর গুরুত্ব : স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। আবার স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলার উদ্দেশ্য হলো রোগ প্রতিরোধ করা। মানুষ যতই রোগের কারণ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে, ততই সে রোগ প্রতিরোধের উপায় জানতে ও প্রয়োগ করতে পারবে। এর কারণ, অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করা। তাই সুস্থ শরীর ও দীর্ঘজীবন লাভের জন্য যা করা প্রয়োজন তা আমরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠে জানতে পারি। 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'—এই প্রবাদ বাক্যটির মর্ম অনুধাবন করতে হলে অর্থাৎ স্বাস্থ্যের ন্যায় মূল্যবান সম্পদ লাভ করতে হলে আমাদেরকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। আমাদের স্বাস্থ্যের উপর পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাব রয়েছে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, সংক্রামক ব্যাধির রোগজীবাণু একের দেহ থেকে অন্যের দেহে সংক্রমণ ঘটায়; কীভাবে সংক্রামক রোগ, ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণ হয় এবং প্রতিরোধে করণীয় কী তা জানা প্রয়োজন। এর প্রতিরোধে করণীয় বিশুদ্ধ পানি পান, দূষিত বায়ু থেকে রক্ষা, পুষ্টিকর সুষম খাদ্য গ্রহণ, আলো বাতাসময় গৃহে বাস, স্বাস্থ্যকর স্কুলগৃহ, নিরাপদ পথ চলা, হিংস্রপশু বা পাগলা কুকুর ও শিয়ালের কামড় থেকে আত্মরক্ষা, মলমূত্র আবর্জনা দূরীকরণ প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর সকল ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠে আমরা বিশদভাবে অবহিত হই। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠে আমরা স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে জানতে পারি। স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ করা। রোগ প্রতিরোধ ও রোগের প্রতিকার স্বাস্থ্যনীতির অন্তর্ভুক্ত। তবে রোগভেদে রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিরোধের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হবে। কেবল কলেরা, যক্ষ্মা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের একই রকম প্রতিরোধ বা প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে না। দূষিত বায়ু, পানি, পচা, বাসি ও খোলা খাবার, গৃহবর্জ্য ও মলমূত্র নিষ্কাশনের অব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এসব রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। এমনিভাবে উন্নত ব্যবস্থাপনার ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবিধান নিশ্চিত করা স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম লক্ষ্য। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা, উদাসীনতা সুস্বাস্থ্য গঠনের প্রধান অন্তরায়। উপযুক্ত শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার, প্রভৃতি ব্যবস্থা এই অন্তরায় দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের একজন সদস্য। তাই শুধু ব্যক্তির কল্যাণ নয় সমাজের সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করতে এবং স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলতে উপদেশ দিতে হবে।

কাজ–১ : স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝ তা পৃথকভাবে লেখো এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

কাজ–২ : বিশুদ্ধ পানি ও বায়ু আমাদের প্রাণ রক্ষা করে আবার সেই পানি ও বায়ু দূষিত হলে রোগের সংক্রমণও ঘটায়। এ বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে বিশদভাবে আলোচনা করো এবং যথাযথ উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

পাঠ–২ : ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার ধারণা ও এর কৌশল : শারীরিক সুস্থতা আনন্দময় জীবনের পূর্বশর্ত। শরীর সুস্থ না থাকলে পড়ালেখায় মন বসে না, কোনো কাজে আনন্দ পাওয়া যায় না অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে কোনো কাজ সম্পন্ন করা যায় না। কোনো কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা এবং সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন নিজেকে সুস্থ রাখা। স্বাস্থ্যহীন দেহকে সুস্থ ও সবল করে তোলা কঠিন। সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য শরীরের যত্ন নিতে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মেনে চলতে হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষা কী? শরীরের গঠন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখা এবং নীরোগ থাকাই হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষা। নিজ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ও এ বিষয়ের সকল নিয়মকানুন মেনে চলাকেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা বলে। স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টি দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত। শিশুকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত একজন মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক উন্নতি ঘটে। এ সময়ে তাকে বয়স উপযোগী স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয়। তাই দৈহিক স্বাস্থ্যের সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যও ঠিক রাখতে হবে। কারণ শরীরের সাথে মনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার কৌশল : সুস্থভাবে জীবন যাপনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তোলার ভিত্তি হচ্ছে স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়মকানুন বা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা যেমন বাড়ি, বিদ্যালয়, আশপাশের রাস্তাঘাট প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতা, প্রয়োজনীয় ও পরিমিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও ঘুম, প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত খেলাধুলা করা ইত্যাদি। এসব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে দেহ ও মনকে সুস্থ ও সবল রাখা যায়। শরীরের যত্ন বিষয়ক সকল কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করাও স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রধান বিষয়।

হাসি-খুশি ও প্রফুল্ল থাকা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটি মৌলিক বিষয়। এজন্য বিনোদনমূলক কাজকর্ম যেমন—খেলাধুলা, ভ্রমণ, আনন্দদায়ক ও শিক্ষামূলক বইপত্র পড়া, বাগান করা, সংস্কৃতি চর্চা, ধর্মীয় আচার ইত্যাদি পালন করা প্রয়োজন। সময়ানুবর্তিতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সকল কাজ সময় মেনে সম্পন্ন করতে হবে। পুষ্টিকর খাদ্য পরিমাণমতো খাওয়া, নিয়মিত ও স্বাভাবিকভাবে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস, মাদকদ্রব্য থেকে দূরে থাকা প্রভৃতি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল। সুস্থ জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল সম্পর্কে জানা ও তা মেনে চলা একান্ত আবশ্যক।

কাজ–১ : শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কাজ, নিয়ম, বিধি ইত্যাদির সাহায্যে নিচের ছকটি পূরণ করো।

শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কাজ/বিধি	মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কাজ/বিধি
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

কাজ–২ : প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় তুমি কী কী কর—অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ–৩ : সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা ও তার প্রতিকার : রোগ বা অসুখ জীবনের অংশ। সারা জীবনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে রোগ এড়ানো এবং রোগকে প্রতিরোধ করা যায়। সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা বলতে শরীর রোগাক্রান্ত হওয়াকে বোঝায়। তাই রোগের আক্রমণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য রোগের ধরন, রোগের জীবাণু এবং কীভাবে রোগ ছড়ায় তা জানা প্রয়োজন।

রোগের কারণ : নানা রকমের জীবাণুর সংক্রমণে শরীর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের চারপাশে নানারকম জীবাণু প্রতিনিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রোগজীবাণু নানা উপায়ে দেহে প্রবেশ করে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে রোগ জীবাণু দ্বারা শরীর আক্রান্ত হয় এবং শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যার শরীর সবল ও মজবুত তাকে রোগজীবাণু সহজে কাবু করতে পারে না, সে সুস্থ থাকে।

রোগের ধরন : কোনো কোনো রোগ, আক্রান্ত রোগীর কাছ থেকে আশপাশে অন্যদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের রোগকে সংক্রামক রোগ বলে। মানুষের শরীর ছাড়াও কোনো বাহকের মাধ্যমেও সংক্রমক রোগ ছড়াতে পারে। যেমন—পানি, খাদ্য, বাতাস ইত্যাদি। স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে সর্দি-কাশি, চোখ উঠা, উদরাময়, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া, হাম, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যক্ষা, টাইফয়েড, জন্ডিস রোগগুলো প্রধান। যেসব রোগ এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যের শরীরে সংক্রমিত হয় না, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি একাই সে রোগ বহন করে, সেসব রোগকে অসংক্রামক রোগ বলে। যেমন—ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যা : আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসমস্যা বহুমুখী। দেশে বসন্ত, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমলেও কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়সহ নানাবিধ পেটের পীড়ার বিস্তার অনেক বেশি। পুষ্টিহীনতা, বিশুদ্ধ পানির অভাব, স্বাস্থ্যসমস্যা ও বাসগৃহ না থাকা, যোগ্য চিকিৎসক ও ওষুধপত্রের অভাব, মা ও শিশুমৃত্যুর উচ্চহার, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে অসচেতনতা প্রভৃতি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে।

স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিকার : রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে আত্মসচেতনতা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। রোগের সংক্রমণ যাতে না ঘটে সেজন্য সব সময়ই সতর্ক থাকতে হবে। রোগ সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার সকল উপায় অবলম্বন করতে হবে যাতে শরীর সুস্থ থাকে। শরীর সুস্থ ও সবল থাকলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও দৃঢ় থাকে। রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে প্রতিটি রোগের প্রতিরোধের উপায়গুলো জানা প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। তবে সাধারণভাবে কতকগুলো ব্যবস্থা নিলে অধিকাংশ সংক্রমক রোগই প্রতিরোধ করা যায়। যেমন–

১। **টিকা গ্রহণ** : যেসব রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, যথাসময়ে শিশু ও বয়স্কদের সেই টিকা নিতে হবে। আমাদের দেশে যেসব রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেগুলো হলো—বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস ইত্যাদি।

২। **ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা** : নিজ শরীর, পোশাক, আসবাবপত্র, রান্নার তৈজসপত্র, থালা-বাসন, বসবাসের স্থান, বাথরুম, বাড়ির চারপাশ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩। **সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস** : প্রতিবার শৌচকাজ শেষে, খাবার তৈরি ও পরিবেশনের আগে, খাদ্য গ্রহণের আগে, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করার পরে, শিশুদের মলমূত্র পরিষ্কার করার পরে, প্রতিবার বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

৪। **খাদ্য প্রস্তুত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশন** : স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশনে যত্নবান হওয়া এবং খাবার সব সময় ঢেকে রাখা খুবই জরুরি। এজন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৫। **কীটপতঙ্গ** : কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে সাবধান থাকা, জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার করা প্রভৃতি ব্যবস্থা সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা ও অবহেলার জন্যই প্রধানত সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। এ কারণে আমাদের দেশে প্রতি বছর বহু লোকের মৃত্যু হয়।

৬। **রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি** : রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, পোস্টার, সিনেমা, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

কাজ–১ : তোমার বাড়িতে বসবাসকারী এবং পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে গত বছর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এমন ৫ জনের একটি তালিকা তৈরি করে নিচের ছকটি পূরণ করো:

পরিবারের সদস্য	গত বছরে তিনি যে সকল রোগে ভুগেছেন	এগুলোর কোনটি	
		সংক্রামক	অসংক্রামক
১. ২. ৩. ৪. ৫.			

কাজ–২ : প্রতিদিন তোমাদের বাড়িতে যতরকম গৃহস্থালির কাজ করা হয় (যেমন–ফলমূল কাটা, খাদ্য প্রস্তুত, পানি ফুটানো, ঘর ঝাড়ু দেওয়া ও মোছা) তেমনি তিনটি কাজ মনে করো। এই কাজগুলো করার সময় রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধমূলক করণীয়গুলো উল্লেখ করে ছকটি পূরণ করো।

গৃহস্থালির কাজ	সংক্রমণ প্রতিরোধমূলক করণীয়
১. ফলমূল কাটা ২. ৩.	১. ফল নিরাপদ ও জীবাণুমুক্ত পানি দ্বারা ধোয়া, ছুরি বা বঁটি ধুয়ে নেওয়া। ফল কেটে পরিষ্কার পাত্রে রাখা, ঢেকে রাখা। ২. ৩.

পাঠ–৪ : **শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যকার্ড** : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষা তথা জ্ঞান লাভের জন্য যায় তারা শিক্ষার্থী নামে পরিচিত। শিক্ষার্থীরা ছয় থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। বছরে ৭/৮ মাস, সপ্তাহের ছয়দিন এবং প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত তাদেরকে বিদ্যালয়ে অবস্থান করতে হয়। দেশ বা জাতির জন্য ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তাদের বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন সময় খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, আসবাবপত্র, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি যদি তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হয় তাহলে তাদের শরীর ও মন সুস্থ ও সবল হয়ে গড়ে উঠবে না। মানসিক উন্নতি তথা নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে বিদ্যালয়। আদর্শ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে সৎ গুণাবলি অর্জন করতে সমর্থ হয়। তেমনি শারীরিক সুষম বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যেমন — বিশুদ্ধ পানি, পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ মধ্যাহ্নকালীন টিফিন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা-প্রস্রাবখানা, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশ করে এমন শ্রেণিকক্ষ, উন্মুক্ত খেলার মাঠ, ফুল ও ফলের বাগান এমন ধরনের বিদ্যালয় হলো স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের উন্নত স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিচের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে–

ক. বিদ্যালয় : খোলামেলা জায়গা যেখানে চারদিক থেকে অবাধে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে, শব্দ দূষণ থাকে না এবং সহজে যাতায়াত করা যায় এমন উঁচু স্থানে বিদ্যালয়ের অবস্থান হতে হবে।

খ. খেলার মাঠ : খেলাবিহীন শিক্ষার্থীর জীবন কল্পনা করা যায় না। বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠ থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা সারাবছর বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা এই মাঠে চর্চা করতে পারবে।

গ. স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি পায়খানা ও প্রস্রাবখানা : শ্রেণিকক্ষ থেকে কিছুটা দূরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও প্রস্রাবখানা এবং পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঘ. বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ : বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম অনুষঙ্গ। শহরে সরবরাহকৃত পানি ফুটিয়ে পান করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। গ্রামাঞ্চলে গভীর নলকূপের পানি বিশুদ্ধ, তাই তা পানযোগ্য। পুকুরের পানি হলে তা ব্যবহারের পূর্বে ফুটিয়ে নিতে হবে।

ঙ. শ্রেণিকক্ষ, আসবাবপত্র : অস্বাস্থ্যকর না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কার্যক্রম : বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কার্যক্রম (School Health Programme) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার্থীরা গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীত ঋতুতে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। পূর্ব থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এসব রোগ থেকে সহজে আরোগ্য লাভ করা যায়। যদি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কার্যক্রম থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা এই কার্যক্রমের আওতায় সাধারণ রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে–

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা : শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। এজন্য একজন উপযুক্ত চিকিৎসক পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জেলার সিভিল সার্জনের তত্ত্বাবধানে এসব পরিদর্শক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে হাজির হয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করবেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শককে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবেন। স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বয়স, ওজন, রক্তের গ্রুপ, রক্তের চাপ, নাড়ির গতি, দৈহিক গঠন, চোখ, কান, দাঁত, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি বিষয় পরীক্ষা করবেন এবং একটি কার্ডে তা লিখবেন। এই কার্ডকে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য কার্ড বলে।

স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র : স্বাস্থ্য কর্মসূচি যেসব বিদ্যালয়ে নেই সেখানে একজন শিক্ষককে কিছু সাধারণ প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর অসুস্থতা জটিল হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের সহায়তা গ্রহণ করা যায় অথবা হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল কিংবা বিশেষায়িত হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য কার্ড : মোটা কাগজের স্বাস্থ্য কার্ডটিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি মুদ্রিত অবস্থায় থাকবে। কার্ডে যা থাকবে তা হলো–

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা

নমুনা স্বাস্থ্য কার্ড

১। শিক্ষার্থীর নাম --

২। পিতা/মাতার নাম --

৩। ঠিকানা --

৪। জন্ম তারিখ ------------------------------------ বয়স ------------

৫। শ্রেণি ------------------------------------ রোল নং ----------

৬। উচ্চতা ------------------------------------ ওজন -----------

৭। শরীরের গঠন কাঠামো --

৮। রক্তচাপ --

৯। চোখ/নাক/কান/গলা/ফুসফুস/হৃৎপিণ্ড ------------------------------------

১০। অতীত অসুস্থতা --

১১। বর্তমান অসুস্থতা --

১২। পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখ ও সময় ------------------------------------

স্বাস্থ্য পরিদর্শকের স্বাক্ষর

কাজ–১ : একটি স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয়ের বর্ণনা বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো।

কাজ–২ : বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাজ এবং একটি নমুনা স্বাস্থ্যকার্ড তৈরি করো। এরপর শ্রেণিতে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো।

পাঠ–৫ : শিক্ষার্থীদের মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রোগ্রাম : 'সর্বজনীন সাক্ষরতা' অর্জনের জন্য ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন নামক স্থানে বিশ্ব সম্প্রদায়ের এক আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায়

''সবার জন্য শিক্ষা'' নামে এক কর্মসূচি গৃহীত হয়। এই কর্মসূচি অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী দেশসমূহে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নীতি ঘোষিত হয়। লক্ষ্য ছিল ২০০৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে হবে। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ না করলে অধিকাংশ শিশু কীভাবে পড়তে বা লিখতে হয় তা শিখতে পারবে না। ফলে নিরক্ষরতার দুষ্টচক্র থেকে কোনো দেশ বেরিয়ে আসতে পারবে না। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের অনগ্রসরতা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠী দরিদ্র এবং তাদের বসবাস গ্রামাঞ্চলে। সরকার ঘোষিত 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হচ্ছে না। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তারা ঝরে পড়ে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শিক্ষা কোর্স সম্পূর্ণ করতে পারে না। এর অনেকগুলো কারণ আছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন অধিকাংশ শিক্ষার্থী ক্ষুধার্ত থাকে। পেটে ক্ষুধা থাকলে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের পড়ায় মন বসে না। এজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন খাবার কর্মসূচি চালু করে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের প্রান্তীয় জনগোষ্ঠী দরিদ্র বিধায় তাদের সন্তানদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। এসব শিক্ষার্থীর অনেকেই অল্প খেয়ে অথবা অভক্তি অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসে। তারা অপুষ্টিতে ভোগে, পড়াশোনায় মন বসে না এবং অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত হয়। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রোগ্রাম চালু করা হয়।

মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য : এই প্রোগ্রামের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো–

১। শ্রেণিকক্ষে অবস্থানকালীন সময়ে ক্ষুধা নিবারণ।

২। বিদ্যালয়ে ভর্তির পর ঝরে পড়া রোধ এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি।

৩। শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সহাবস্থান, সহমর্মিতা বৃদ্ধি।

৪। অপুষ্টি রোধ এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।

৫। খেলাধুলা ও স্কাউট কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ।

৬। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের উপর থেকে খাদ্য সংস্থানের চাপ দূরীভূতকরণ এবং তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।

পুষ্টিকর টিফিন : বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীকে ৭–৮ ঘণ্টা অবস্থান করতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ে তারা স্বাভাবিভাবে ক্ষুধার্ত হয়। এই সময়ের মাঝে তাদেরকে টিফিন সরবরাহ করলে টিফিন খেয়ে তারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করে বিদ্যালয়ের পরবর্তী পাঠসমূহে মনোনিবেশ করতে পারে। এতে তাদের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর হয়। তাদের লেখাপড়ার মান উন্নত হয়। দুপুরের এই খাবারের মান যত উন্নত হবে ততই তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো বোধ করবে। কাজেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের এই মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রোগ্রামের সফল বাস্তবায়ন করে সার্বিকভাবে ''সবার জন্য

শিক্ষা'' কর্মসূচিকে এগিয়ে নেবে, শিক্ষার হার বাড়বে এবং সর্বোপরি একটি সুস্থ জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

> কাজ–১ : ''সবার জন্য শিক্ষা'' কর্মসূচির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে তোমার দৃষ্টিতে প্রধান অন্তরায়সমূহ কী কী তা বোর্ডে লোখো। এরপর দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো।
>
> কাজ–২ : মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ যুক্তিসহ লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্বাস্থ্য রক্ষা কী?

ক. বেশি বেশি ঘুমানো　　খ. নীরোগ থাকা

গ. আনন্দদায়ক ভ্রমণ　　ঘ. চর্বি জাতীয় খাবার গ্রহণ

২. স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলার উদ্দেশ্য হলো–

i. রোগের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা

ii. স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম মেনে চলা

iii বেশি বেশি খাবার গ্রহণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৩. বিদ্যালয়ে টিফিন প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য–

i. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি করা

ii. মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি করা

iii. লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সোনাপুর গ্রামের বিদ্যালয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন ঐ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার বেশি। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক জানালেন এ অঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষার্থী দরিদ্র ও অসুস্থ থাকে। এ গ্রামে বিশুদ্ধ পানির অভাব। শিক্ষা কর্মকর্তা পরিচালনা কমিটির সাথে আলোচনা করে ঐ এলাকায় টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করেন এবং পানি বিশুদ্ধ করানোর উপায় সংবলিত পোস্টার তৈরি করে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচারণা চালান।

৪. সোনাপুর গ্রামের শিক্ষার্থীরা কী ধরনের রোগে আক্রান্ত?

ক. ডায়াবেটিস	খ. হাঁপানি
গ. ডায়রিয়া	ঘ. এনিমিয়া

৫. নিম্নের কোনটি শিক্ষার্থীদের এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের সহায়ক?

ক. স্বাস্থ্য সচেতনতা	খ. লেখাপড়ার মান বাড়ানো
গ. দামি খাবার গ্রহণ	ঘ. পরিবেশ উন্নতকরণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দুজনের কথোপকথন–

ফুলি- ফুল নিবেন আপা, ফুল। মাত্র দশ টাকায় এক তোড়া ফুল। ভাত খাব আপা, নেন না।

অন্তরা- এদিকে আয়। ফুল কিনে জিজ্ঞেস করে– স্কুলে যাস না কেন? তোর মা-বাবা নেই?

ফুলি- খেতেই পারি না, আবার স্কুল।

অন্তরা- মিনা কার্টুনের ছবিটা দেখিয়ে বলে প্রাথমিকের লেখাপড়ার জন্য কোনো খরচ নাই। স্কুলে দুপুরে সামান্য খাবারেরও ব্যবস্থা আছে।

ক. মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক বিষয় কী?

খ. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বলতে কী বোঝায়?

গ. ফুলির বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ক্ষুধার্ত শিশুদের স্কুলে ধরে রেখে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম সফল করা কি সম্ভব- ব্যাখ্যা করো।

২.

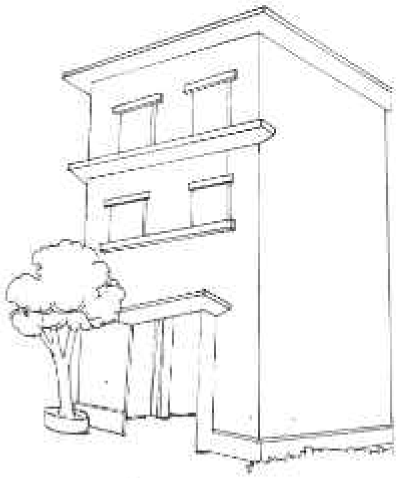

আবিদার আবাসস্থল

নিলুর আবাসস্থল

নীলু ও আদিবা দুই বান্ধবী। তারা নবম শ্রেণিতে পড়ে। আদিবা নিয়মিত স্কুলে আসলেও নীলু স্কুলে প্রায়ই অনিয়মিত। অনেকদিন পর স্কুলে আসলে শিক্ষকের প্রশ্নের জবাবে সে বলে, 'প্রায়ই তার পেট ব্যথা থাকে, সাথে বমি ও পাতলা পায়খানা হয়'।

ক. আনন্দদায়ক জীবনের পূর্বশর্ত কী?

খ. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়া রোধ করা যায় কীভাবে- ব্যাখ্যা করো।

গ. নীলু কী ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আদিবা সুস্থ থাকার পিছনে কোন বিষয়টি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টি

স্বাস্থ্য কী অর্থাৎ স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি তা প্রথমে জানা দরকার। সাধারণত আমরা স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক সুস্থতা বা শরীরের নীরোগ অবস্থাকে বুঝি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে কেবল শারীরিক সুস্থতাই সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, শরীরের সাথে মনের সুস্থতাও প্রয়োজন। অতএব দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থতাকে পরিপূর্ণ সুস্থ বলা যায়। বেঁচে থাকা, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং শরীরের বৃদ্ধির জন্য মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন। তবে এই খাদ্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ও সুষম হতে হবে। যে সকল খাদ্য শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে সেগুলো পুষ্টিকর খাদ্য। সুষম খাদ্য সেই সকল খাদ্যের সমাহার যাতে সকল খাদ্য উপাদান যথাযথ অনুপাতে ও পরিমাণে থাকে। সুষম খাদ্য শরীরে পুষ্টি জোগায়।

সুষম খাদ্য

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- পুষ্টির ধারণা ও শিক্ষার্থীদের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুষ্টিহীনতার ধারণা ও এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্রীড়াক্ষেত্রে পুষ্টিহীনতার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খেলোয়াড়দের জন্য পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বয়সভেদে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরিসমৃদ্ধ খাদ্যতালিকা তৈরি করতে পারব।
- খাদ্যে বিষক্রিয়া প্রতিরোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব।

পাঠ–১ : পুষ্টির ধারণা ও এর প্রয়োজনীয়তা : বয়সন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের দৈহিক বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হয়। শারীরিক এই বৃদ্ধিকে সহায়তা করার জন্য পুষ্টির প্রয়োজন। শরীরে শক্তি জোগায়, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধের জন্য বাড়ন্ত বয়সে সকল উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্যসামগ্রী যথাযথ পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়। পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য না খেলে শরীর ও মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এজন্য অন্যান্য সময়ের তুলনায় বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন অনেক বেশি। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা, দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা প্রভৃতি নিয়ে মেতে থাকে। শারীরিক পরিশ্রমের কারণে তাদের বেশি ক্যালরি বা খাদ্যশক্তির প্রয়োজন হয়। পুষ্টিমান কম এমন খাদ্য গ্রহণ করলে দেহের বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

খাদ্য উপাদান : খাদ্যে মোট ৬টি উপাদান আছে। এগুলো হলো প্রোটিন বা আমিষ, কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা, ফ্যাট বা স্নেহ, ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, মিনারেল বা খনিজ পদার্থ এবং পানি। যে খাদ্যে যে উপাদান আছে সেই খাদ্য সেই উপাদানের নামে পরিচিত। যেমন–যে খাদ্যে আমিষ আছে তা আমিষ জাতীয় খাদ্য, যাতে শর্করা আছে তা শর্করা জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি।

খাদ্য উপাদানের উৎস ও এর গুণাগুণ : খাদ্যের আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় উপাদান দেহ গঠন করে, দেহের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে। আমিষ জাতীয় খাদ্য দেহে কর্মশক্তি জোগায় এবং রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, পনির, ছানা, সব রকম ডাল, শিমজাতীয় সবজির বীজ ইত্যাদিতে আমিষ পাওয়া যায়। শর্করা ও শ্বেতসার প্রধানত তাপ ও কর্মশক্তি জোগায়। চাল, গম, ভুট্টা, আলু, চিনি, মধু, ওল, মিষ্টি ইত্যাদি শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্য। চর্বি বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। মাখন, ঘি, চর্বি, সয়াবিন, সরিষার তেল, দুধ, মাছের তেল, নারিকেল তেল ইত্যাদিতে স্নেহ বা ফ্যাট রয়েছে। দেহের রোগ প্রতিরোধ করা ও দেহের ভিতরে বিভিন্ন কাজকর্ম সচল রাখা, দেহকে রক্ষা করা ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের কাজ। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মাছের তেল, সবুজ ও লাল রঙের শাক-সবজি, ফল, সব রকমের ডাল, তেলবীজ, ঢেকি ছাঁটা চাল, ভুসিযুক্ত আটা, অঙ্কুরিত বীজ প্রভৃতি ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য। দেহের অভ্যন্তরীণ গঠনের কাজ সম্পাদনের জন্য খনিজ পদার্থ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেহে লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ থাকে এবং তা প্রতিদিন মলমূত্র এবং ঘামের সাথে বেরিয়ে গিয়ে শরীরের ক্ষয়সাধন করে। এ ক্ষয় পূরণের জন্য খনিজ লবণ পাওয়া যায় এমন খাদ্য যেমন লবণ, দুধ, দুধজাত খাদ্য, ছোট মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম, নানা রকম ডাল, শাকসবজি, লেবু, কলা, ডাবের পানি ইত্যাদি খেতে হয়। দেহের শতকরা ৭০ ভাগ পানি। পানি দেহের গঠন বজায় রাখে ও দেহকে ঠান্ডা ও সচল রাখে, খাদ্য হজমে সাহায্য করে, রক্ত চলাচলে ও দেহের অভ্যন্তরে পুষ্টি পরিবহণ এবং দেহের বর্জ্য নিঃসরণে সহায়তা করে। শরীর রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য যথাসময়ে সুষম খাদ্য পরিমাণমতো গ্রহণ করা প্রয়োজন। উপরে উল্লিখিত খাদ্য উপাদানসমূহ যে সকল খাদ্যে যথাযথ অনুপাতে ও পরিমাণে থাকে তাই সুষম খাদ্য। বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিন্ন হয়। একটি শিশুর জন্য যতটুকু আমিষ, শর্করা ও অন্যান্য উপাদানসংবলিত খাদ্য প্রয়োজন, একজন কিশোর বা কিশোরীর প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি। অতএব বয়স, লিঙ্গ, দৈহিক কাঠামো অনুযায়ী এই সুষম খাদ্যের চাহিদারও ভিন্নতা হবে।

কাজ–১ : নিচের ছকে কলাম–১ ও কলাম–২ তে যথাক্রমে খাদ্যের নাম এবং তা দেহের কোন কাজে লাগে তা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। প্রতিটি খাদ্য দেহের যে কাজে লাগে তীর চিহ্ন দিয়ে তার সাথে মিলাও।

কলাম–১ খাদ্য	কলাম–২ প্রধানত দেহের যে কাজে লাগে
• চাল	• রোগ প্রতিরোধ করে
• রঙিন শাকসবজি	• দেহের খনিজ পদার্থের চাহিদা পূরণ করে
• সব রকমের ফল	• রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে
• আয়োডিনযুক্ত লবণ	• দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করে
• কচু শাক	• রক্ত চলাচলে সাহায্য করে
• মাংস ও ডিম	• দেহকে ঠান্ডা ও সচল রাখে
• পানি	• দেহের ক্ষয়পূরণ করে
• মাখন	• দেহকে বর্জ্য নিঃসরণে সাহায্য করে
• সব রকমের ডাল	• তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে

পাঠ–২ : পুষ্টিহীনতার কারণ ও প্রতিকার : বেঁচে থাকা, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং শরীরের বৃদ্ধির জন্য মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য দেহের পুষ্টিসাধন করে। সুন্দর স্বাস্থ্য, সুস্থ মন, কাজে উৎসাহ ও পরিশ্রম করার প্রবণতা সুপুষ্টির লক্ষণ। পরিশ্রম করার জন্য শক্তির দরকার। পুষ্টিকর খাদ্য মানুষের পরিশ্রম করার জন্য শক্তির জোগান দেয়। খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদান দেহে এসব কাজ করে দেহের পুষ্টি সাধন করে।

খাদ্য উপাদানের কাজ : খাদ্য উপাদানের কাজের ভিন্নতা রয়েছে। এসব উপাদান দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও কর্মশক্তি সরবরাহ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও সচল রাখা, রক্ত চলাচল, পুষ্টি পরিবহণ, দেহবর্জ্য অপসারণ, দেহ শীতলীকরণ প্রভৃতি বহুমাত্রিক কাজ করে।

সুষম খাদ্য ও চাহিদা : খাদ্যের ৬টি উপাদান যখন আদর্শ অনুপাতে গ্রহণ করা যায়, সেই খাবারকে সুষম খাদ্য বলে। তবে বয়স ও লিঙ্গভেদে দৈহিক কাঠামো অনুযায়ী সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও চাহিদাও ভিন্ন হয়। যেমন–একটি শিশুর জন্য যতটুকু আমিষ, শর্করা ও অন্যান্য উপাদানসংবলিত খাদ্য প্রয়োজন, একজন কিশোর বা কিশোরীর প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি। আবার একজন শ্রমিক বা খেলোয়াড়ের খাদ্যের পরিমাণ তার থেকে আরও বেশি হবে।

পুষ্টিহীনতার ফলে সৃষ্ট রোগ : শিশুর খাদ্যে আমিষের পরিমাণ কম হলে মাংসপেশি গড়ে উঠার বদলে ক্ষয় পেতে থাকে। শরীরে পানি আসে, ফুলে যায় ও শিশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ রোগের নাম কোয়াশিওরকর। আমিষ, শর্করা, চর্বি প্রভৃতি পুষ্টির অভাবে শিশু মেরাসমাস রোগে আক্রান্ত হয়। এটা শিশুর আমিষ ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালরির অভাবজনিত রোগ। লৌহ, আমিষ ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান রক্তের রক্তকণিকা তৈরি করে। খাদ্যে এসব উপাদানের ঘাটতি থাকলে রক্তস্বল্পতা বা এনিমিয়া হয়। খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি'র অভাব হলে শিশুর রিকেটস রোগ হয়। আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড হয়। ভিটামিনে এ'র অভাব হলে রাতে দেখতে অসুবিধা হয়। থিয়ামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ, রিবোফ্লাবিনের অভাবে ঠোঁটে, জিহ্বায় ও মুখে ঘা, ভিটামিন সি'র অভাবে স্কার্ভি প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।

পুষ্টিহীনতার কারণ : পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ অজ্ঞতা ও অসচেতনতা। পরিবারের বাড়ন্ত শিশুদের চাহিদা বাদ দিয়ে বয়স্ক ব্যক্তিদের মাছের মাথা, দুধের সর, পনির, মাছ বা মাংসের বড় টুকরা পরিবেশন করা মারাত্মক ভুল। বয়স্ক লোকের যেমন আমিষ ও চর্বির চাহিদা কম হয় তেমনি এর বিপরীতে বাড়ন্ত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের চাহিদা হয় অনেক বেশি। খাদ্য পরিবেশনে ভুল নীতির দরুন পুষ্টিহীনতা খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

পুষ্টিহীনতার প্রতিকার

১। দামি খাদ্যের পরিবর্তে একই পুষ্টিমান ও উপাদানসমৃদ্ধ কম মূল্যের খাদ্য নির্বাচন করতে হবে।

২। খাদ্য সম্পর্কে কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা যেমন–হাঁসের ডিম, বোয়াল মাছ, গজার মাছ, মিষ্টি কুমড়া প্রভৃতি খাওয়া যাবে না, এরূপ ধারণা পরিহার করতে হবে।

৩। বাবা-মাকে পুষ্টিমানযুক্ত খাবারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে হবে।

৪। অধিক সময় ধরে রান্না করলে অনেক শাকসবজির খাদ্যগুণ নষ্ট হয় তা বাবা–মাকে জানাতে হবে।

৫। শাকসবজি রান্নার আগে ধুয়ে নিতে হবে। কাটার পর ধোয়া চলবে না।

৬। আমিষজাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য বাড়িতে হাঁস, মুরগি, গাভী পালনের জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৭। বড় মাছের দাম বেশি বলে এগুলোর পরিবর্তে ছোট মাছ খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৮। খাদ্য উপাদান অনুসারে একটি তালিকা তৈরি করে সেখান থেকে দৈনন্দিন খাদ্য বাছাই করে পরিবারে যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। পুষ্টি, পুষ্টিহীনতা, প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ে রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

কাজ–১ : তোমাদের এলাকায় যে সব খাদ্য স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায় সে সকল খাদ্যের নাম দিয়ে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করো।

কাজ–২ : পুষ্টিহীনতার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লেখো এবং দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো।

পাঠ–৩ : বয়স অনুসারে খেলোয়াড়দের খাদ্য তালিকা ও ক্যালরির চাহিদা : খাদ্য দেহের পুষ্টি সাধন করে। সুন্দর স্বাস্থ্য, সতেজ মন, কাজে উৎসাহ ও পরিশ্রম করার প্রবণতা সুপুষ্টির লক্ষণ। পরিশ্রম করার জন্য শক্তির দরকার। যেকোনো হাতিয়ার যেমন–দা, কুড়াল, ছুরি দিয়ে কাজ করলে এক সময় সেগুলো ভোঁতা হয়ে যায়, কাঠ ব্যবহারের ফলে ক্ষয় হয়, জুতা পুরোনো হলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হাতের আঙুল দিয়ে অনবরত কাজ করা হলে কিংবা পা দিয়ে হাঁটা বা অন্য কাজ করা হলে তা ক্ষয় হয়ে যায় না। কারণ খাদ্য দেহের ক্ষয়পূরণ করে, পরিশ্রম করার শক্তি দেয়। মোট কথা খাদ্য দেহযন্ত্রকে সচল ও কর্মক্ষম রাখে। খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদান দেহে এসব কাজ করে দেহের পুষ্টি সাধন করে। ছয়টি খাদ্য উপাদান যথা আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, অজৈব লবণ, ভিটামিন ও পানি যথাযথ অনুপাতে যে খাদ্যে পাওয়া যায় তাকে সুষম খাদ্য বলে। সুষম খাদ্যের এসব উপাদানের কাজ বিভিন্ন প্রকারের। বয়স, দেহের ওজন এবং পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে

বিভিন্ন ব্যক্তির খাদ্য চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন শৈশবে সর্বাধিক আমিষের দরকার। শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় এমন ব্যক্তির তাপ উৎপাদনকারী খাদ্যের প্রয়োজন। সন্তানসম্ভবা এবং প্রসূতি মায়ের খাদ্যপুষ্টির চাহিদা সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশি। আবার রোগ ভোগের পর পুষ্টির চাহিদা স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা বেশি থাকে। একজন খেলোয়াড় খেলাধুলা করার জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করে বলে তার খাদ্যচাহিদা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকে।

শক্তি ও ক্যালরির পরিমাণ : আমিষ, শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্য পরিপাক হওয়ার পর দেহে তাপ উৎপন্ন করে। খাদ্য হতে উৎপন্ন তাপ মেপে খাদ্যের ক্যালরির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। খাদ্যের ক্যালরি মূল্য কিলোক্যালরিতে প্রকাশ করা হয়। যেমন–২৫০ গ্রাম দুধ থেকে ১৬৫ কিলোক্যালরি এবং এক চা চামচ চিনি থেকে ১৬ কিলোক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। খাদ্যে নিহিত তাপ দেহযন্ত্রকে সচল রাখে, শরীরে কাজ করতে শক্তি জোগায়। খেলাধুলা করার জন্য, দৌড়ানো, রিকশা বা ঠেলাগাড়ি চালানো, নির্মাণ শ্রমিকের কাজ প্রভৃতিতে বেশি শক্তি ব্যয় হয়। শরীরের ওজন বেশি হলেও কাজে বেশি শক্তি ব্যয় হয়। দেহের প্রয়োজনীয় শক্তিকে তাপের আকারে এবং কিলোক্যালরির হিসাবে উল্লেখ করা যায়। হালকা, মাঝারি ও ভারী কাজ করার জন্য কতটুকু কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয় তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো। এই তালিকার মধ্যে দৌড়ানো ও খেলাধুলার জন্য শক্তির উল্লেখ রয়েছে।

প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ–

কাজের ধরন	শক্তি (কিলোক্যালরি)
গোসল, পোশাক পরা, খাওয়া ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজ	৩–৪
বসা বা দাঁড়িয়ে থাকা	১.৫–১.৯
পায়ে হাঁটা	৩–৫
স্কুল-কলেজে পড়াশোনা, লেখা, সেলাই, টাইপ করা, রান্নাবান্না ইত্যাদি	১.৫–২
জুতার কারিগের মতো মাঝারি শ্রম	২.৫–৪.৫
কাঠ চেরাই, পাথর ভাঙা, বোঝা বহন করা প্রভৃতি ভারী শ্রমের কাজ	৫–১০
দৌড়ানো ও খেলাধুলা করা	৪–৮

কিলোক্যালরি শক্তি পরিমাপের পদ্ধতি : কোনো কাজ করার জন্য কার কতটুকু শক্তির দরকার তা উপরের তালিকা থেকে নির্ণয় করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ–৫৫ কেজি ওজনের একজন খেলোয়াড়ের দুই ঘণ্টা খেলার কাজে শক্তি খরচ হবে– ৫৫ কেজি × ২ ঘণ্টা × ৪ কিলোক্যালরি = ৪৪০ কিলোক্যালরি। সুতরাং কাজ করার জন্য কী পরিমাণ শক্তির দরকার তা নির্ভর করে দেহের ওজন ও কাজের ধরনের উপর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালরি দেহে মেদ বৃদ্ধি করে। একজন পুরুষ ও একজন মহিলার দৈনিক ক্যালরির চাহিদার ভিন্নতা রয়েছে। পুরুষের প্রতি পাউন্ড ওজন ২১ দিয়ে এবং মহিলার প্রতি পাউন্ড ওজন ১৮ দিয়ে গুণ করে যে গুণফল পাওয়া যাবে তাই হবে তাদের ক্যালরির দৈনিক চাহিদা। তবে মনে রাখতে হবে যে দৈনিক যে পরিমাণ ক্যালরির প্রয়োজন তা তিন বেলার আহার থেকে গ্রহণ করা উচিত।

বয়স অনুসারে খাদ্য উপাদানের দৈনন্দিন চাহিদা

বয়স	শক্তি (কি: ক্যালরি)	প্রোটিন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি: গ্রাম:)	আয়রন (মি: গ্রাম:)	ভিটা -এ (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটা:বি-১ (মি: গ্রাম:)	ভিটা:বি-২ (মি: গ্রাম:)	ভিটা:সি (মি: গ্রাম:)
কিশোর-কিশোরী (১৩-১৫ বছর)	২৫০০ ২২০০	৫৫ ৫০	৬৫০ ৬৫০	১৮ ২৪	৭২৫ ৭২৫	১.৩ ১.৩	১.৪ ১.৪	৩০ ৩০
ছেলে-মেয়ে (১৬-১৮ বছর)	৩০০০ ২২০০	৬০ ৫০	৫৫০ ৫৫০	৯ ২৪	৭৫০ ৭৫০	১.৫ ১.১	১.৭ ১.২	৩০ ৩০
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	২৪০০	৫৫	৪৫০	৯	৭৫০	১.২৫	১.৩	৩০
প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোক	১৯০০	৫০	৪৫০	২৮	৭৫০	১.০	১.০	৩০

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ

খাদ্যের মৌলিক শ্রেণি	ছেলে		মেয়ে
	১৩-১৫ বছর গ্রাম	১৬-১৮ বছর গ্রাম	১৩-১৮ বছর গ্রাম
দুধ বা দুধজাত খাদ্য	১৮৭.৫	১৮৭.৫	১৮৭.৫
ডিম (সপ্তাহে ৩ দিন)	১টি	১টি	১টি
মাছ-মাংস	৬২.৫	৬২.৫	৬২.৫
ডাল	৬২.৫	৬২.৫	৬২.৫
বাদাম (মাঝে মাঝে)	৬২.৫	৬২.৫	৬২.৫
ফল	৬২.৫	৬২.৫	৬২.৫
সবুজ শাক	১২৫.০	১২৫.০	১৪০.০
অন্যান্য সবজি	১৮৭.৫	২৫০.০	১৮৭.৫
ভাত	১৮৭.৫	২৫০.০	১৮৭.৫
রুটি	১৮৭.৫	১৮৭.৫	১২৫.০
আলু	৬২.৫	৬২.৫	৬২.৫
চিনি/গুড়	৩১.২৫	৪৬.৫	৩১.২৫
তেল/চর্বি	৪৬.৫	৬২.৫	৪৬.৫

> কাজ–১ : বিভিন্ন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের উপর কী পরিমাণ কিলোক্যালরি শক্তি ব্যয় হয় তার একটি তালিকা তৈরি করো।
>
> কাজ–২ : বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈনিক খাদ্য চাহিদা একটি ছকে উল্লেখ করো।

পাঠ–৪ : খাদ্যে বিষক্রিয়া, কারণ, লক্ষণ ও প্রতিবিধান : আমরা যা খাই তাকেই খাদ্য বলা যায় না। বরং যা খেলে আমাদের শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও তাপ সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন হয় তাকে খাদ্য বলে। শারীরিক ক্রিয়াকর্মের কারণে প্রতিনিয়ত আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। খাদ্য দ্বারা আমাদের শরীরের এই ক্ষয়পূরণ হয় এবং দেহ কর্মক্ষম রাখে। তবে এ সকল খাদ্য হতে হবে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এবং সুষম। অতিরিক্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্যও আবার শরীরের উপকার না করে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। খাদ্য যদি দূষিত হয়ে পড়ে তাহলে দূষিত খাবার খেয়ে যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। দূষিত খাদ্য বিষাক্ত এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করে। যে খাদ্য বা পানীয় খাদ্যনালির ও পাকস্থলীর অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু দ্বারা বিষাক্ত হয় সে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করলে ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়।

কারণ : সাধারণত ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) দ্বারা সংক্রমিত অথবা টক্সিন (Toxin) বা বিশেষ ধরনের জৈববিষ দ্বারা খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ব্যাকটেরিয়া নানাভাবে খাদ্যে প্রবেশ করে। যেমন–খাবার তৈরি করে অনেকক্ষণ রেখে দিলে, খাবার তৈরির আগে, তৈরির সময় এবং পরে, বাজার থেকে সংক্রমিত খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের সময়, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের সংস্পর্শে প্রভৃতি বিভিন্নভাবে খাদ্য বিষাক্ত হতে পারে। আবার প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করলে তা পচে গিয়ে টক্সিন বিষ তৈরি হয়। এরূপ পচা খাদ্য গ্রহণ করলে ফুড পয়জনিং হবে। এছাড়া বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত জীবজন্তুর মাংস এবং জীবজন্তুর সাথে নির্গত রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত খাদ্য, অপরিষ্কার হাত দিয়ে তৈরি খাদ্য, বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হাঁস-মুরগির মাংস, প্রভৃতিও খাদ্যে বিষক্রিয়ার অন্যতম কারণ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : ব্যাকটেরিয়াজনিত দূষিত খাবার থেকে পাকস্থলীর অন্ত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়; ফলে বমি বমি ভাব, বমি, তলপেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা এবং পানিশূন্য হয়ে শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। আর টক্সিনজাত বিষাক্ত খাদ্য শরীরে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। বমি, কোষ্ঠবদ্ধতা, দৃষ্টিশক্তির বিকৃতি, স্নায়ুর পক্ষাঘাত, দুর্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। এ ধরনের ফুড পয়জনিংকে বটিউলিজম বলা হয়। এরূপ বিষক্রিয়ার লক্ষণ খাদ্য গ্রহণের ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা পরে দেখা যায়। যথাসময়ে চিকিৎসা গ্রহণ না করলে রোগী কয়েক দিনের মধ্যে মারা যায়।

প্রতিবিধান

১। খাদ্য প্রস্তুত করার পূর্বে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

২। সংক্রমণ থেকে খাদ্যকে সুরক্ষিত করার জন্য খাদ্যের প্রস্তুতি ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। নিরাপদ দূষণমুক্ত পানি পান করতে হবে।

৪। কাঁচা শাকসবজি, মাছ-মাংসে যাতে রান্না করা খাবারের সংস্পর্শে না থাকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫। রান্না করা খাবার নির্ধারিত তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। রান্নার কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসা : বমি বমি ভাব বা বমি হলে বমি নিরোধক ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। পানিশূন্যতা রোধে মুখে খাওয়ার স্যালাইন ORS- (Oral Rehydration Solution) খেতে হবে। ফুড পয়জনিংয়ের ফলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে অথবা দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

কাজ–১ : কীভাবে খাদ্যে বিষাক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা ধারাবাহিকভাবে লেখো এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো।

কাজ–২ : খাদ্যে বিষাক্রিয়ার ফলে বিষাক্ত খাবার খেলে কী কী লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কীভাবে এর প্রতিবিধান করা যায় তার দুটি তালিকা আলাদাভাবে তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের কখন দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুত ঘটে?

ক. শৈশবকাল খ. বাল্যকাল

গ. বয়ঃসন্ধিকাল ঘ. যৌবনকাল

২. কোনটি দেহে কর্মশক্তি জোগায়?

ক. শর্করা খ. ভিটামিন

গ. খনিজ লবণ ঘ. স্নেহ

৩. পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার তারতম্য হয় কীসের ভিত্তিতে?

ক. দৈহিক গঠন খ. সহজলভ্যতা

গ. সুলভ মূল্য ঘ. মানসিক গঠন

৪. খাসির মাংসে কীভাবে টক্সিন বিষ তৈরি হয়?

ক. যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে খ. খোলা স্থানে দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখলে

গ. অধিক তাপে রান্না করলে ঘ. অপরিচ্ছন্ন স্থানে দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখলে

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নবম শ্রেণির ছাত্র রাহিমুর স্কুল শেষে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো চটপটির দোকান থেকে ফুচকা কিনে খায়। বাড়ি যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর তার তলপেটে ব্যথা, বমি ও পাতলা পায়খানা দেখা দেয়। এতে তার শরীর ঠান্ডা হয়ে নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগলে তার বাবা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার তাকে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেন।

৫. রাহিমুরের রোগটির ধরন কী?

ক. ডায়রিয়া | খ. ফুড পয়জনিং
গ. জন্ডিস | ঘ. আমাশয়

৬. উক্ত রোগের প্রেক্ষিতে ডাক্তার রাহিমুরকে কী নির্দেশনা দিতে পারেন?

ক. পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ | খ. বাইরের খোলা খাবার পরিহার করা
খ. শরীরচর্চার প্রতি যত্নশীল হওয়া | ঘ. খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়া

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চার বৎসরের মিনা সব সময় তার পছন্দ অনুযায়ী খাবার খায়। সে শুধু শাকসবজি খেতে পছন্দ করে। মাঝে মাঝে তার শরীরে পানি আসে এবং শরীর ফুলে যায়। এ অবস্থায় ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন এবং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে বলেন।

৭. মিনা কী রোগে আক্রান্ত হয়েছে?

ক. রিকেটস | খ. এনিমিয়া
গ. মেরাসমাস | ঘ. কোয়াশিওরকর

৮. মিনার এ রোগ থেকে প্রতিকারের জন্য কী ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন?

ক. মাছ, মাংস ও দুধ | খ. চাল, গম ও আলু
গ. মাখন, ঘি ও চর্বি | ঘ. ফল, ডাল ও ঢেঁকিছাটা চাল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জারিফ ও আহনাফ উভয়ের বয়স ৭ বছর। তাদের উচ্চতা যথাক্রমে সাড়ে ৩ ফুট ও ৪ ফুট। সম্প্রতি জারিফের শরীরে পানি এসে ফুলে যায়। এতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দেখতে স্বাস্থ্যবান মনে হলেও শারীরিকভাবে সে খুবই দুর্বল। অন্যদিকে আহনাফ প্রতিদিন যথারীতি স্কুলে যায়। কিন্তু রাতে পড়তে ও দেখতে তার চোখে অসুবিধা হয়। ফলে সে পড়াশুনায় অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে।

ক. খাদ্য উপাদান কয়টি?

খ. কীভাবে খাদ্যে বিষক্রিয়া তৈরি হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. জারিফ কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে–ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সমস্যা সমাধানে রোগের ধরন উল্লেখপূর্বক আহনাফের জন্য কী করণীয় তা সুপারিশ কর।

২.

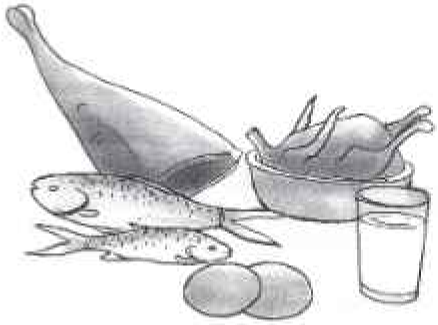

A

B

ক. ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে কী রোগ হয়?

খ. খাদ্য পরিবেশনে ভুলনীতির ফলে কী হতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

গ. A চিত্রের খাদ্য উপাদানগুলোর কাজ বর্ণনা করো।

ঘ. উপরে বর্ণিত B চিত্রের খাদ্য উপাদানটি কি জীবন রক্ষায় অপরিহার্য–উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাদকাসক্তি ও এইডস

মাদকাসক্তি হলো ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর এমন একটি মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত ব্যক্তি ও তার সেবনকৃত মাদকের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ঐ দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি, পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি বা নেশাকে বোঝায়। সিগারেট, বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, গাঁজা, চরস, আফিম, মারিজুয়ানা, হেরোইন, মরফিন, ফেনসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য। এ এক ভয়ংকর নেশা। এই নেশায় আসক্ত হলে সহজে কেউ পরিত্রাণ পায় না। আমাদের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার কারণে শরীরে কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করলে সহজে শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু ক্ষতিকর ভাইরাস আছে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। এইচআইভি তেমনই একটি ভাইরাস। এইচআইভি ভাইরাস রক্ত, বীর্য, যোনিরস, বুকের দুধ প্রভৃতির মাধ্যমে অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়। কোনো মানুষের শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশ করলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রচলিত চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে উঠে না। এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তির অবস্থাকে বা রোগকে এইডস বলে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মাদকাসক্তির কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- তামাক ও মাদক দ্রব্য সেবনের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধূমপান ও মাদক থেকে বিরত থাকার কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ মাদকমুক্ত থাকার ব্যাপারে অন্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধূমপান ও মাদকের কুফল উপলব্ধি করে এগুলো পরিহার করার ব্যাপারে সচেতন হব।

- মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে সমর্থ হব।
- HIV-AIDS-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশে HIV-AIDS-এর বিস্তার ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- HIV-AIDS-এর বিস্তার প্রতিরোধে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- HIV-AIDS-থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- HIV-AIDS-প্রতিরোধে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবাদানের ধরন সম্পর্কে জানতে পারব।
- HIV-AIDS-এর পরিণতি উপলব্ধি করে পরিশীলিত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ–১ : মাদকাসক্তি, তামাক ও মাদকদ্রব্য এবং তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল : মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি বা নেশাকে বোঝায়। যেসব দ্রব্য সেবন বা পান করলে তীব্র নেশার সৃষ্টি হয় সেগুলো মাদকদ্রব্য। কোনো কোনো ওষুধকে ব্যবহারগত কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঔষধ অতিরিক্ত সেবন করলে এবং এর প্রতি আসক্তি জন্মালে সেটাও মাদকদ্রব্যের আওতায় পড়ে। অতএব যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং সেগুলোর প্রতি সেবনকারীর প্রবল আসক্তি জন্মে সেসব দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। যেমন—বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, মদ, গাঁজা, ভাং, হেরোইন, আফিম, পেথিডিন, ফেনসিডিল, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি। যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। তারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। যদি কোনো কারণবশত তারা মাদক গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তাদের মধ্যে মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক উপসর্গের সৃষ্টি হয়। যেমন—মেজাজ খিটখিটে হয়, ক্ষুধা ও রক্তচাপ কমে যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, আচরণে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে।

ঔষধ ও মাদকদ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য

১. ওষুধ সেবন করলে রোগমুক্তি ঘটে, মাদক সেবনে শরীরের নানা রোগের সৃষ্টি হয়।

২. ওষুধ গ্রহণের মাত্রা নির্ধারিত থাকে, মাদকের মাত্রা নির্ধারিত থাকে না।

৩. অসুখ সেরে গেলে ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মাদকে আসক্ত হলে সহজে ছাড়া যায় না।

বাংলাদেশে যে সকল মাদকদ্রব্য প্রচলিত আছে সেগুলো হলো হেরোইন, আফিম, পেথিডিন, ফেনসিডিল, গাঁজা জাতীয়– মারিজুয়ানা, ভাং, চরস, ইয়াবা এবং ঘুমের ঔষধ, মদ এবং তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্য। তামাক গাছের পাতা থেকে তামাকজাতীয় মাদকদ্রব্য তৈরি হয়। তামাক পাতায় নিকোটিন থাকে যা এক ধরনের মাদক। তামাক পাতা দিয়ে বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, পানের জর্দা, গুল, নস্যি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

মাদকদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যম : যারা মাদকসেবী তারা নানা পদ্ধতি ও মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সেবন করে। যেমন ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো, ট্যাবলেট, পাউডার বা সিরাপ হিসেবে খাওয়া, পানীয় হিসেবে পান করা, ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা। ধূমপানেরও আবার নানা ধরন আছে। যেমন–সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, হুঁকা ইত্যাদি।

২০১৮

তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল : তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবন বলতে প্রধানত ধূমপানকে বোঝায়। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতি ৮ সেকেন্ডে শুধু ধূমপানজনিত কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে। যারা ধূমপান করে তারা ও ধূমপায়ী ব্যক্তির ছেড়ে দেওয়া ধোঁয়া থেকে অন্যরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মাদকদ্রব্য সেবনের কুফলসমূহ হচ্ছে–

১. মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। যেমন–শেখার ও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস করে, চাপ সহ্য করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে। তাছাড়া মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয়।

২. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে। মাদকসেবী পরিবারের সদস্যদের সাথে উগ্র আচরণ করে, পরিবারের শান্তি বিনষ্ট করে।

৩. শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। মাদকদ্রব্য সেবন মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে, খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে, চোখের দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয়।

৪. কিছু কিছু মাদক এইচআইভি ও হেপাটাইটিস–বি-এর সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। খাদ্যনালি ও ফুসফুসের ক্যান্সার, কিডনির রোগ, রক্তচাপ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের সৃষ্টি করে।

৫. আর্থিক ক্ষতি হয়। নেশার টাকা জোগাতে গিয়ে সংসারে অভাব ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

কাজ–১ : মাদক সেবনকারীদের মাদকের উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। এই নির্ভরশীলতার ফলে কী কী ঘটে তা নিচে উল্লেখ করো।

১.

২.

৩.

৪.

কাজ–২ : মাদকদ্রব্য গ্রহণের ৪টি কুফল লেখো।

১.

২.

৩.

৪.

পাঠ–২ : ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকার উপায় এবং এ সম্পর্কে অন্যদের ভূমিকা : ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে পূর্ববর্তী পাঠে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য বিষয়টি সম্পর্কে শুধু জানাই যথেষ্ট নয়। মানুষের জীবনের জন্য ক্ষতিকর এমন মারাত্মক অভ্যাসটি যাতে ত্যাগ করা যায় সেজন্য এখনই সে বিষয়ে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রথমই দরকার কোনো অবস্থাতেই ধূমপানসহ অন্য কোনো মাদকদ্রব্য গ্রহণ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

কারণ কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে অজানা বিষয়ের প্রতি প্রচণ্ড কৌতূহল থাকে। এই কৌতূহল ও উত্তেজনাবশে কিংবা বন্ধুবান্ধবসহ কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা ধূমপান বা মাদক সেবন করতে পারে। এই কৌতূহল বা উত্তেজনা সারা জীবনের জন্য তার অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই কৌতূহল মিটাবার পূর্বে ঐ কিশোর বা কিশোরীকে ভাবতে হবে ধূমপান বা মাদক সেবনের ফলে কী কী কুফল দেখা দেবে এবং এই কুফলসমূহ বিবেচনা করলে তার মাদক সেবন করা উচিত হবে কি না। ধূমপান ও মাদক সেবন থেকে বিরত থাকতে হলে নিচের ধারাবাহিক কার্যক্রমগুলো অনুসরণ করতে হবে। যেমন–

১। ধূমপান ও মাদক সেবনের ফলে কী অবস্থা হয়, প্রথমে তা মনে মনে ভাবতে হবে।

২। ধূমপান বা মাদক সেবনের ফলে মা-বাবা, ভাই-বোন বা অভিভাবক এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বেন, লজ্জিত হবেন। শিক্ষকেরা বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করবেন না। এ অবস্থা যাতে না হয় সেজন্য ভাবতে ও বিবেচনা করতে হবে।

৩। এরপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মনস্থির করবে। ধূমপান বা মাদক সেবন না করার বিষয়ে প্রথমেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এই সর্বনাশা কাজ থেকে বিরত থাকা যায়।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদ চিহ্নিত করে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অন্য কোনো সূত্রে সংগ্রহ করতে হবে। তথ্যের প্রেক্ষিতে করণীয় সমাধান চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের সচেষ্ট হতে হবে।

৫। ধূমপান ও মাদক সেবন থেকে শুধু নিজে বিরত থাকলে চলবে না, বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী, পরিচিতজনকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে তারা যেন এই মারাত্মক নেশা থেকে দূরে থাকে।

৬। মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক জেনে সবার উচিত এ থেকে নিজে মুক্ত থাকা, বন্ধুবান্ধব ও অন্যদেরকে এর কবল থেকে মুক্ত থাকতে অর্থাৎ মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে সবাইকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা।

মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে অন্যদের ভূমিকা : মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত বন্ধুবান্ধবদের ক্ষতিকর প্রভাব বেশ বড় ভূমিকা পালন করে। তবে সব বন্ধুই কি মাদকাসক্ত, নিশ্চয়ই না। দু একজন হয়ত দুর্ভাগ্যক্রমে মাদকাসক্ত হয়, তবে বেশির ভাগ বন্ধুই ভালো হয়। এই ভালো বন্ধুরাই অন্য বন্ধুদেরকে মাদক গ্রহণ না করার জন্য প্রভাবিত করতে পারে। মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে বন্ধু বা সমবয়সি ছাড়াও আরও অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– সন্তানের প্রতি অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষক আদর্শস্বরূপ। শিক্ষকের আদেশ ও উপদেশ শিক্ষার্থীরা আন্তরিকভাবে পালন করে। শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষকের আদেশ ও উপদেশে শিক্ষার্থীরা মাদক পরিহার করে চলতে পারে। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীরাও স্নেহ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দিয়ে ছেলেমেয়েদের মাদকমুক্ত থাকতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম যেমন–পত্রপত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন মাদক বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এর বাইরে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়।

কাজ–১ : মাদকদ্রব্য গ্রহণের এমন ৪টি কুফল লেখো যা ভাবলে তুমি কখনো ধূমপান ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে পারবে না।

১. ২. ৩. ৪.

কাজ–২ : তোমাদের স্কুলকে ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে? লেখো।

পাঠ–৩ : মাদকাসক্তির ঝুঁকি, ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল : যারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাদের সংখ্যা অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। মাদকাসক্তদের একটা বড় অংশ হচ্ছে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ। এছাড়াও রয়েছে পথশিশু, শ্রমজীবী শিশু, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকজন যেমন–শ্রমিক, ব্যবসায়ী, রিকশাচালক, বাস-ট্রাক চালক, অন্যান্য পেশার লোকজন এবং যৌনকর্মী। তাদের মধ্যে মাদকাসক্তি বিস্তারের বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে মাদক প্রাপ্তির সহজলভ্যতা। অন্যান্য যেসব কারণ রয়েছে তা হলো হতাশা, বেকারত্ব, পারিবারিক অশান্তি, কৌতূহল, মন্দ বন্ধুদের কাছ থেকে এক ধরনের চাপ ইত্যাদি।

মাদকাসক্তির ঝুঁকি : মাদকদ্রব্য গ্রহণের জন্য কিশোর-কিশোরীদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। বন্ধু বা সহপাঠীদের মধ্যে কেউ মাদকসেবী থাকলে সে প্রস্তাব দিতে বা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া যারা মাদক ব্যবসায়ী বা মাদক বিক্রেতা তারাও কিশোর-কিশোরীদের মাদক গ্রহণের জন্য নানাভাবে প্ররোচিত করতে পারে। এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বন্ধুরা চাপ সৃষ্টি করলে যদি কেউ চাপের কাছে নতি স্বীকার করে মাদক গ্রহণ করা শুরু করে তবে তার সর্বনাশ ঘটে। আবার মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়। বন্ধু বা সহপাঠী ছাড়া অন্য কেউ যদি মাদক গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করলে তার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এ ধরনের ঝুঁকির পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলা : প্রথমেই দেখতে হবে মাদক গ্রহণের জন্য যে বা যারা প্ররোচনা দিচ্ছে তার বা তাদের আচরণ, ক্ষমতা, প্রভাব কেমন। এসব দিক বিবেচনা করে মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে যাতে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সময় নিজেকে সংযত রাখতে হবে। আর যদি সরাসরি 'না' বলতে পারা না যায় তাহলে কৌশলে পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সে স্থান ত্যাগ করতে হবে। চাপ সৃষ্টি করা ব্যক্তি যদি বন্ধু বা পরিচিতজন হয় তবে এমনভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে যেন সম্পর্ক নষ্ট না হয়। আর যদি মনে হয় যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে না তাহলে তাকে মাদকের কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং এ পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। আর মাদক গ্রহণের জন্য যদি চাপ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তবে অবিলম্বে মা-বাবা বা অভিভাবক কিংবা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে বিষয়টি জানাতে হবে। সর্বনাশা মাদক থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হলে কৌতূহলের বশবর্তী হয়েও কোনো মাদক গ্রহণ করা যাবে না। যেকোনো মাদক নিঃসন্দেহে নিজের, পরিবারের ও সমাজের জন্য খারাপ। সর্বোপরি মাদক গ্রহণ না করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে।

কাজ–১ : মাদকাসক্তির ফলে নিজের ও পরিবারের উপর কী কী প্রভাব পড়ে?

কাজ–২ : কোনো ব্যক্তি মাদকগ্রহণ করে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে একটি ক্ষেত্রের সমস্যা উল্লেখ করে তার সমাধান কী হবে তা সংক্ষেপে লেখো।

পাঠ–৪ : মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠন : মাদকাসক্তি বর্তমান সমাজের জন্য একটি বড় সমস্যা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং তা ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করছে। যারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে তারা তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না বটে, কিন্তু মাদক গ্রহণের কারণে তারা নানা ধরনের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। মাদকের কারণে শুধু যে মাদকাসক্ত ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, মাদকাসক্ত ব্যক্তির মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার জীবনে এর প্রভাব পড়ে এবং সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা মাদকের অর্থ জোগাড় করার জন্য চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানিসহ বিভিন্ন অসামাজিক ও বেআইনি কাজকর্মে লিপ্ত হয় যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য খুবই ক্ষতিকর। মাদকাসক্তির ভয়াবহ পরিণতি থেকে যুব সমাজসহ দেশের সবাইকে রক্ষা করতে হলে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন ও সোচ্চার করতে হবে। মাদকদ্রব্য যাতে সহজে না পাওয়া যায় তার জন্য যে আইন আছে সে আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন করে তুলতে জনমত গঠন করতে হবে।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে স্লোগান ব্যবহার করা ছাড়াও আরও যেভাবে মাদকের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা যায় সেগুলো হচ্ছে–

১. রেডিও-টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য গ্রহণের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা।

২. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও ভয়াবহতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা।

৩. মাদকবিরোধী সভা-সমিতি, পথ নাটক, গান, কবিতা, নাটক, যাত্রা পালা, অভিনয়, র‍্যালি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

৪. মসজিদ, মন্দির, গির্জায় মাদকবিরোধী ধর্মীয় বিধান তুলে ধরা ও মাদক গ্রহণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা এবং মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।

৫. মাদক ও ধূমপানবিরোধী দিবস পালনসহ অন্যান্য সময়ে বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। যেমন–দলগত আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, লিফলেট বিতরণ, পোস্টার প্রদর্শন ইত্যাদি।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অফিস, সংস্থা, দপ্তরকে ধূমপান ও মাদকমুক্ত এলাকা ঘোষণাপূর্বক তা কার্যকর করা।

৭. বিদ্যালয়ের খাতা, নোটবুকের মলাটে মাদকবিরোধী স্লোগান দিয়ে সকলকে সচেতন করা।

জনসচেতনতা সৃষ্টির সময় ''মাদক কিছুই দেয় না বরং কেড়ে নেয় সবকিছু'' এরূপ স্লোগান দিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণা চালাতে হবে। মাদকসেবীরা মনে করে মাদক মানুষকে দুঃখ ভুলতে সাহায্য করে এবং আনন্দ দেয়—এটা একেবারেই ভুল ধারণা। মাদক বরং আরও যন্ত্রণা টেনে আনে। কাজেই পরিচিতজনের মধ্যে কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে তাকে এই সর্বনাশা পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত।

কাজ–১ : এমন একটি স্লোগান তৈরি করো যার সাহায্যে মাদকের বিরুদ্ধে জনগণকে আকৃষ্ট ও সচেতন করা যাবে।

কাজ–২ : তোমার এলাকায় ধূমপানবিরোধী প্রচারণা চালাতে তুমি কী করবে?

১.

২.

৩.

৪.

৫.

পাঠ–৫ : এইচআইভি (HIV) ও এইডস (AIDS) কী : এইচআইভি ও এইডস দুটি ইংরেজি শব্দ। শব্দ দুটির পূর্ণাঙ্গ রূপ হচ্ছে– Human Immuno Deficiency Virus (HIV) এবং Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)। এইচআইভি একটি অতি ক্ষুদ্র বিশেষ ধরনের ভাইরাস যা কোনো মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে প্রবেশ করে রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংসের মাধ্যমে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখন সে ব্যক্তি নানা ধরনের রোগ যেমন ডায়রিয়া, যক্ষা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ঘনঘন আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসায় এ সমস্ত রোগ ভালো হয় না। এইচআইভি সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূপ অবস্থাকে এইডস (AIDS) বলে। এইচআইভি কোনো ব্যক্তির শরীরের প্রবেশের পর সাথে সাথে কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না। এইডস হিসেবে প্রকাশ পেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। সাধারণত এটা মনে করা হয়ে থাকে যে এইচআইভি সংক্রমণের শুরু থেকে এইডস হওয়ার সময় ৬ মাস থেকে বেশ কয়েক বছর হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ বছর অথবা তারও বেশি সময় পরে এইডস ধরা পড়ে। এই সময়কালকে সুপ্তাবস্থা বলে। এই সময়ের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তি সংক্রমিত হতে পারে।

এইডস-এর লক্ষণসমূহ : এইডস-এর নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নেই। তবে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য যে রোগে আক্রান্ত হয় সে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে। যেমন—(১) এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা কাশি, (২) সারা দেহে চুলকানিজনিত চর্মরোগ, (৩) মুখ ও গলায় এক ধরনের ঘা, (৪) লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া, (৫) স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া ইত্যাদি।

এইডস-এর প্রধান লক্ষণগুলো হলো–

১। শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পাওয়া।

২। এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা বা থেমে থেমে পাতলা পায়খানা হওয়া।

৩। বারবার জ্বর হওয়া বা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া।

৪। অতিরিক্ত ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করা।

৫। শুকনো কাশি হওয়া ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, কারোর মধ্যে উপরের একাধিক লক্ষণ দেখা দিলেই তার এইডস হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে HIV সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

এইচআইভি এবং এইডস–এর বিস্তার : এইচআইভি একটি নীরব ঘাতক। এই নীরব ঘাতকের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে এইচআইভি ও এইডস কীভাবে বিস্তার লাভ করে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। বায়ু, পানি, খাদ্য বা কারোর সংস্পর্শে এইচআইভি ছড়ায় না। HIV আক্রান্ত মানুষের শরীরের ভিতরে রক্ত, মায়ের বুকের দুধ এগুলোতে HIV বাস করে। HIV আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করলে বা মায়ের বুকের দুধ খেলে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে। সুনির্দিষ্টভাবে যে যে উপায়ে এইচআইভি বিস্তার লাভ করে, তা হলো :

১। অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন—এইচআইভি ছড়ানোর সবচেয়ে বড় কারণ অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সারা বিশ্বের এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিদের ৮০% অনিরাপদ যৌন মিলনের কারণে হয়েছে।

২। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ–এইডস আক্রান্ত কোনো মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপন কিংবা তার ব্যবহৃত সুচ-সিরিঞ্জ অন্য মানুষ ব্যবহার করলে ব্যবহারকারীর শরীরে এই ভাইরাস ছড়িয়ে যেতে পারে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই একই সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করে মাদক গ্রহণ করে থাকে।

৩। মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে সংক্রমণ —

এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত মায়ের নিকট থেকে তিনটি পর্যায়ে শিশুর শরীরে এর ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–

(ক) গর্ভকালীন সময়ে।

(খ) প্রসবকালীন সময়ে।

(গ) মায়ের দুধ পান করে।

যেসব কারণে এইচআইভি-এইডস-এর বিস্তার লাভ করে না তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

(১) হাঁচি, কাশি, কফ-থুতু বা শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে।

(২) এক সাথে এক ঘরে বসবাস করলে, একসাথে বা একই থালা-বাসনে খাওয়া দাওয়া করলে।

(৩) একসাথে খেলাধুলা বা একই ক্লাসে পড়াশোনা করলে।

(৪) আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে হাত মেলালে, কোলাকুলি করলে এবং তার কাপড় ব্যবহার করলে।

(৫) মশা বা কোনো পোকামাকড়ের কামড়ে।

(৬) আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে।

(৭) একই গোসলখানা বা শৌচাগার ব্যবহার করলে।

এইচআইভি ও এইডস-এর মতো মরণব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সকলের এ বিষয়ে জানতে হবে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কাজ–১ : এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত হলে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় তা বোর্ডে লেখো এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

কাজ–২ : এইচআইভি কীভাবে ছড়ায় এবং ছড়ায় না এ বিষয়ে নিচের বিবৃতির বিপরীতে সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লোখো।

বিবৃতি	স/মি	বিবৃতি	স/মি
১. এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে		৭. আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবা করলে	
২. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একই থালায় খাবার খেলে		৮. আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড়চোপড় ব্যবহার করলে	
৩. আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত নিজ শরীরে গ্রহণ করলে		৯. আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে	
৪. সুস্থ ব্যক্তির শরীরে জীবাণুমুক্ত রক্ত সঞ্চালন করলে		১০. আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে	
৫. মশা বা পোকামাকড়ের কামড়ে		১১. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে	
৬. আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করলে			

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তামাক পাতা দিয়ে কী তৈরি হয়?

ক. আফিম　　খ. গাঁজা

গ. চুরুট　　ঘ. ভাং

২. মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে–

i. অসংলগ্ন আচরণ পরিলক্ষিত হয়

ii. পারিবারিক অশান্তি ঘটে

iii. খাবারের রুচি হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৩. মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাটি সবচেয়ে ভালো?

ক. নিয়ন্ত্রণমূলক　　খ. শাস্তিমূলক

গ. সহায়তামূলক　　ঘ. প্রতিরোধমূলক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রানা প্লাজা ধসে আহত শামীমকে চিকিৎসার জন্য কর্তৃপক্ষ তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার তার অত্যধিক রক্তক্ষরণ দেখে দ্রুত রক্ত দেওয়ার কথা বলে। শামীমকে বাঁচানোর তাগিদে উপস্থিত একজন ব্যক্তি তাকে দ্রুত এক ব্যাগ রক্ত দেন। রক্ত নেওয়ার পর অন্যান্য চিকিৎসা শেষে দুই সপ্তাহ পর মোটামুটি সুস্থ হয়ে শামীম বাড়ি ফিরে যায়। মাসছয়েক পর তার শরীরে চুলকানি ও শুকনো কাশি দেখা দেয়। এসবের পাশাপাশি ঘন ঘন জ্বর, পাতলা পায়খানাও হতে লাগল। সে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কিছু ওষুধ দেন এবং পরিবারকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করতে পরামর্শ দেন।

৪. শামীম কী রোগে আক্রান্ত হয়েছে?

ক. ডায়াবেটিস　　খ. হাঁপানি

গ. এইডস　　ঘ. টাইফয়েড

৫. শামীমের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন-

i. মানসিক প্রশান্তি

ii. উপযুক্ত সেবা প্রদান

iii. পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দশম শ্রেণির ছাত্র সজল একজন ভালো ছাত্র। কিছুদিন যাবৎ সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না। প্রায়ই রাস্তায় দুষ্ট ছেলেদের সাথে চলাফেরা করতে দেখা যায়। শ্রেণিশিক্ষক বিষয়টি তার বাবাকে জানালেন। সজলের বাবা নিজেও বিষয়টি লক্ষ করলেন এবং বললেন সে ইদানীং অনেক রাত করে বাড়ি ফিরে। কিছু জিজ্ঞেস করলে রেগে যায়। আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। সজলের বাবা তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য শিক্ষক, প্রতিবেশী ও তার বন্ধুদের সহযোগিতা চাইলেন। বন্ধুরা তাকে নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যায়। মাঝে মাঝে খেলাধুলায় এবং নয়নাভিরাম স্থানে বেড়িয়ে আসে। কিছুদিন পর দেখা গেল সে সুস্থ হয়ে উঠছে।

ক. মাদকদ্রব্য কী?

খ. শেখার ও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায় কেন তা ব্যাখ্যা করো।

গ. সজলের সমস্যাটি কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সজলের সুস্থতার পিছনে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

সপ্তম অধ্যায়

বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য

একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শিশুটির বড় হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়কে কাল হিসেবে ধরা হয়। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর শৈশবকাল। শৈশবকালে ছেলে বা মেয়ে সকলকে শিশু বলা হয়। ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত বয়সকে আমরা বলি বাল্যকাল। বাল্যকালে শিশু মেয়ে হলে বালিকা এবং ছেলে হলে বালক বলা হয়। দশ থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে বা মেয়েকে কিশোর বা কিশোরী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়ে তাদের শরীর যথাক্রমে পুরুষের বা নারীর শরীরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বয়ঃসন্ধিকাল হচ্ছে বাল্যকাল ও যৌবনকালের মধ্যবর্তী সময়। একটি শিশু ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক, তার জন্ম থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তরেই তার সাধারণ স্বাস্থ্যের সাথে প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি জড়িত। তাই প্রজনন স্বাস্থ্য কী এবং এটা রক্ষা করার বিষয়ে সবারই জানা প্রয়োজন।

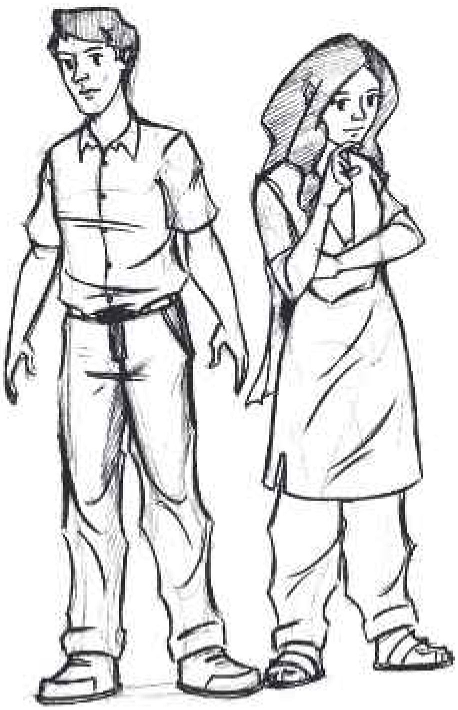

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়ে

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বয়ঃসন্ধিকাল ও বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সময় কী করণীয় তা নির্ধারণ করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে বিভিন্ন প্রকার মানসিক চাপ মোকাবিলার কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজনন স্বাস্থ্য ও তা সুরক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গর্ভকালীন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অটিজম ও থ্যালাসেমিয়া সম্বন্ধে ধারণা লাভ ও বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ–১ : বয়ঃসন্ধিকাল ও বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন : মানুষের জীবনে বয়সের ভিত্তিতে অনেকগুলো পর্যায় আসে। যেমন— শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য। শিশুর জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশবকাল, ছয় থেকে দশ বছর বাল্যকাল, দশ থেকে উনিশ বছর কৈশোরকাল বলা হয়। কৈশোরকালে একটি ছেলে বা মেয়েকে কিশোর বা কিশোরী বলা হয়। কৈশোরকালে কিশোর বা কিশোরীরা শারীরিকভাবে পুরুষ বা নারীতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই কৈশোরকালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল আগে শুরু হয়। মেয়েদের আট থেকে তেরো বছর বয়সের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়। ছেলেদের দশ থেকে পনেরো বছর বয়সে বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে এর আগে বা পরেও বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে দৈহিক বা শারীরিক পরিবর্তনগুলোই প্রথমে চোখে পড়ে। এই পরিবর্তন দেখলেই বোঝা যায় যে কারো বয়ঃসন্ধিকাল চলছে। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো প্রধানত ৩ প্রকার।

১. শারীরিক ২. মানসিক ৩. আচরণিক

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন

কিশোরদের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে–

ক. উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।

খ. শরীরে দৃঢ়তা আসে, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়।

গ. এ বয়সে দাড়ি-গোঁফ উঠে।

ঘ. স্বরভঙ্গ হয় ও গলার স্বর মোটা হয়।

কিশোরীদের পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ–

ক. উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।

খ. শরীর ভারী হয়, শরীরের বিভিন্ন হাড় মোটা ও দৃঢ় হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে সবার ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তনগুলো একই সময়ে ও একই রকম নাও হতে পারে। কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে সকলের উচ্চতা একইভাবে নাও বাড়তে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি নানা রকম মানসিক পরিবর্তনও হয়। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং সময়ের সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীরা এইসব পরিবর্তনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব মানসিক পরিবর্তন সাধারণভাবে দেখা যায়–

ক. অজানা বিষয়ে জানার কৌতূহল বাড়ে।

খ. শারীরিক পরিবর্তনের ফলে চলাফেরায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জা কাজ করে।

গ. স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা করে।

ঘ. নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হয়।

ঙ. আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

চ. ছেলে ও মেয়েদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।

ছ. মানসিক পরিপক্বতার পর্যায় শুরু হয়।

আচরণিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই–

ক. প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করে।

খ. বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নিজেকে একজন আলাদা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

গ. প্রত্যেক বিষয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।

ঘ. দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

কাজ–১ : শিক্ষকের নির্দেশ মতো ৫/৭ জনের দল গঠন কর। তোমার সহপাঠী/সমবয়সিদের কথা ভাব। প্রায় সবার ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমন পরিবর্তনগুলো দিয়ে নিচের ছক দুইটি পূরণ করো। এর শিরোনাম দাও ''সাধারণ পরিবর্তন''। এরপর অবশিষ্ট পরিবর্তনগুলো দিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো। এর শিরোনাম হবে ''অন্যান্য পরিবর্তন''। এটা হবে দলগত কাজ।

বয়ঃসন্ধিকালে সাধারণ পরিবর্তন	
শারীরিক পরিবর্তন	মানসিক পরিবর্তন
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

২০২৫

বয়ঃসন্ধিকালে অন্যান্য পরিবর্তন	
১.	
২.	
৩.	
৪.	

পাঠ–২ : বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ ও পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো : আমরা পূর্বেই জেনেছি যে সাধারণত ছেলেমেয়েদের ১০-১৯ বছর বয়সের সময় কালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়ে ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তবে আবহাওয়া, স্থান, খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও মানের তারতম্যের কারণে এককেজনের বয়ঃসন্ধিকালের শুরুর সময়ে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। হরমোন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যার কারণে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো ঘটে। মেয়েদের শরীরে ও মনে বিভিন্ন পরিবর্তনে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন নামে দুটি হরমোন কাজ করে আর ছেলেদের যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ ঘটে তা টেস্টোস্টেরন নামক হরমোনের কারণে হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ : ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের কারণে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। কারণ পরিবর্তনগুলো অনেকটা আকস্মিকভাবে শুরু হয়। এর সাথে পরিচিত না থাকার কারণে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং অপরাধবোধে ভোগে। এ সময় তাদের বুঝিয়ে বললে তারা আতঙ্কিত হবে না এবং তাদের মনে কোনো অপরাধবোধ কাজ করবে না। এ ধরনের অপরাধবোধ ও মানসিক দুশ্চিন্তা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ফলে ছেলেমেয়েদের মনে সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তি কাজ করে। তারা মানসিক চাপের সম্মুখীন হয় এবং অনেক সময় পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে এবং এ সম্বন্ধে করণীয় বিষয়ে পূর্ব ধারণা থাকলে, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক প্রস্তুতি থাকে। ফলে তারা বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারে, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয় না এবং সম্ভাব্য রোগব্যাধিও প্রতিরোধ করা যায়। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন ঘটলে মা-বাবা, বড় ভাই-বোন বা নির্ভরযোগ্য অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে এ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যেতে পারে। ফলে সংকোচ কেটে যাবে এবং একা থাকার প্রবণতা কমে যাবে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আবেগিক পরিবর্তনও ঘটে। এ বয়সে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে তার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সাথে মা বাবা ও অভিভাবকদের বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। তাদেরকে মানসিক দিকসহ অন্য সব ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান ও সাহস জোগাতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য তাদের নিজেদেরকেও সচেষ্ট থাকতে হবে। তাদের প্রথম কাজ হবে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা। ভালো গল্পের বই পড়লে, সাথিদের সাথে খেলাধুলা করলে মনে প্রফুল্লতা আসবে এবং মানসিক চাপ সামলানো সম্ভব হবে।

কাজ–১ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে তালিকার মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক চাপ থেকে উত্তরণের কয়েকটি উপায় খাতায় লেখো।

পাঠ–৩ : বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। সুস্থ দেহেই বাস করে সুন্দর মন। শরীর সুস্থ না থাকলে কোনো কিছুতেই আনন্দ পাওয়া যায় না। লেখাপড়া করতেও ইচ্ছে করে না। সেজন্য খাদ্য ও পুষ্টির দরকার। আবার যে কোনো খাবার খেলেই যে শরীর ভালো থাকবে তা নয়। কারণ সব ধরনের খাদ্যেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে না। সেজন্য খাদ্য নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন প্রতিদিনের খাবারে আমিষ, শর্করা, চর্বি বা তেল, খনিজ দ্রব্য, ভিটামিন ও পানি প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাওয়া যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও সুষম খাদ্য : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের পুষ্টির প্রয়োজন খুব বেশি। কেননা এই সময়ে ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ বেড়ে উঠে এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। সেজন্য তাদের প্রতিদিনই যথাযথ পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক ছেলে-মেয়ে ও তাদের অভিভাবকেরা এ বিষয়ে গুরুত্ব দেন না। কেউ কেউ মনে করেন যে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান ও পুষ্টি শুধু দামি খাবার ও ফলমূলেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। একটু সচেতন হলেই সহজপ্রাপ্য ও সুলভমূল্যের খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়।

বয়স, দৈহিক গঠন ও কাজের ধরনভেদে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা : ৬টি খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমাহারকে সুষম খাদ্য বলে। বয়সভেদে এই ''প্রয়োজনীয় পরিমাণের'' তারতম্য হতে পারে। যেমন ১৩/১৪ বছর বয়সের কোনো কিশোর বা কিশোরীর পুষ্টির প্রয়োজন একটি ৮/৯ বছরের শিশুর চেয়ে বেশি। একই বয়সের মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীর পুষ্টির প্রয়োজনে কোনো তারতম্য নেই। আবার দু'জন একই বয়সের তরুণ বা তরুণী একজন বেশ দীর্ঘকায় ও স্বাস্থ্যবান এবং অপরজন ছোটখাটো ও সাধারণ স্বাস্থ্যের হলে, দৈহিক গঠনের কারণে প্রথমজনের প্রয়োজনীয় পুষ্টির তথা খাদ্যের পরিমাণ দ্বিতীয় জনের চেয়ে বেশি হবে। দু'জন একই বয়সি ও একই রকম দৈহিক গঠনের পুরুষের মধ্যে যিনি বেশি দৈহিক পরিশ্রম করেন তার খাদ্যের প্রয়োজন বেশি হতে পারে। দু'জন সমবয়সি এবং একই রকম দৈহিক গঠনসম্পন্ন মেয়ের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এভাবে বয়স, দৈহিকগঠন ও কাজের ধরনভেদে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার তারতম্য হয়। কারণ খাদ্যের ৬টি উপাদানের প্রত্যেকটিই বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে-মেয়েদের দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য খুব প্রয়োজন। এগুলো দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়। অন্যথায় যথাযথ পুষ্টির অভাবে দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ছেলেমেয়েরা নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়।

ছয়টি উপাদানসমৃদ্ধ খাবার

> কাজ–১ : কিশোর-কিশোরীদের জন্য সকল খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ একটি দৈনিক সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি কর। এই তালিকায় সহজে পাওয়া যায় এবং দাম কম এমন খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
>
> কাজ–২ : বয়স, শরীরের গঠন ও কাজের ধরন অনুযায়ী ছেলে-মেয়েদের ৬টি খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ এবং পুষ্টিকর খাবার না খেলে কী কী অসুবিধা হয় তা লিখে এনে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

পাঠ–৪ : প্রজনন স্বাস্থ্য ও তা সুরক্ষার উপায় : প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়কে প্রজনন স্বাস্থ্য বলে। তাই প্রজনন বলতে সন্তান জন্মদানকে বোঝায়। পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ জন্ম ও সুস্বাস্থ্য বর্তমান প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য তথা সুস্থ প্রজনন তন্ত্রের উপর নির্ভর করে। তাই স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেকের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় : হরমোনজনিত কারণে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলে ছেলে ও মেয়েরা ভয় পেয়ে যায় এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের ক্ষতি করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঋতুস্রাব ঘটলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত গোসল করা দরকার। এ সময়ে পুষ্টিকর

খাবার ও প্রচুর পানি পান করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রাথমিক অবস্থায় মা-বাবা, নিকটাত্মীয় বা স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে। এ সময়ের মানসিক পরিবর্তনের বিষয়টি মনে রেখে ছেলে বা মেয়েদের সাথে বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। সহযোগিতামূলক আচরণ তাদের অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে, তাদের মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকবে এবং সুস্থভাবে বেড়ে উঠবে। প্রজনন স্বাস্থ্যের বড় ঝুঁকি হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হওয়া ও সন্তান ধারণ। এ কারণে রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়াও মা ও শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি থাকে। প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রাপ্তবয়সে বিয়ে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে সরকারি নির্দেশ মেনে চললে এই ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। নানা কারণে প্রজনন অঙ্গের রোগ দেখা দিতে পারে। প্রজনন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে তা গোপন করা যাবে না। ডাক্তারের নির্দেশমতে ওষুধ ও পথ্য গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে সংক্রামক রোগ এবং যৌনরোগের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

কাজ–১ : প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যা করা প্রয়োজন সেগুলো নিচের ছকে লেখো।

করণীয় কাজ
১.
২.
৩.
৪.

পাঠ–৫ : প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি ও গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যসেবা : মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে শুধু প্রজননতন্ত্রের কাজ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকে বোঝায় না। এটা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি অবস্থা। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ জন্ম ও সুস্বাস্থ্য বর্তমান প্রজন্মের সার্বিক সুস্থতা প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে।

প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

১। **বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি :** বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

২। **উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ :** মেয়েদের ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ করা যাবে না। উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশু উভয়ই সুস্থ থাকে।

৩। **নিরাপদ মাতৃত্ব :** নিরাপদ মাতৃত্ব বলতে বোঝায় গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সময়ে মায়ের সুস্থতা বজায় রাখা। বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এর অন্যতম কারণ গর্ভকালীন সময়ে মায়ের যত্ন হয় না। তিনি পর্যাপ্ত খাদ্য, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা পান না। তাছাড়া অপরিণত বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের ফলে মা ও শিশুর অসুস্থতাও ঘটে। ২০২৫

৪। **শিশুর জন্য পূর্ব যত্ন :** মায়ের গর্ভে সন্তান আসার পর পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য, চিকিৎসা, বিশ্রাম, ঘুম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হয়।

৫। **নবজাতকের পরিচর্যা :** জন্মের পর থেকে ২৮ দিন বয়স পর্যন্ত শিশুকে নবজাতক বলা হয়। জন্মের পর পরই শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো, টিকা প্রদান প্রভৃতি পরিচর্যামূলক সেবা শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬। **মা ও শিশুর পুষ্টি :** আমাদের দেশে অধিকাংশ মা ও শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। গর্ভবতী মা ও প্রসূতি মা অপুষ্টিতে ভোগেন বলেই শিশু অপুষ্টির শিকার হয়। ঘনঘন গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব মা ও শিশুর অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ।

৭। **প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের সেবা ও রোগ প্রতিরোধ :** প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের মধ্যে রয়েছে সংক্রামক রোগ, যৌনরোগ, প্রজনন অঙ্গে ক্যান্সারসহ সব রকম রোগ। এসব রোগের সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনমতো সেবা গ্রহণ করতে হবে।

গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যসেবা : গর্ভধারণ হচ্ছে শরীরের একটি বিশেষ পরিবর্তন। সন্তান গর্ভে এলেই শুধু মায়ের শরীরের এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরে কিছু কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায়। যেমন—ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, মাথা ঘোরা, বারবার প্রস্রাব হওয়া ইত্যাদি। পরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে শারীরিক ও মানসিক তেমন কোনো জটিলতা দেখা যায় না। গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি ও সেবা হচ্ছে–

ক. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

খ. নিয়মিত গোসল করা।

গ. পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, বিশ্রাম ও ঘুম।

ঘ. গর্ভধারণের প্রথম থেকেই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা।

ঙ. গর্ভকালীন সমস্যা মোকাবিলার জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখা।

চ. প্রজননতন্ত্রের যেকোনো সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

ছ. ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা। এছাড়া পড়াশোনাসহ বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক কাজে নিজেকে জড়িত রাখা ইত্যাদি।

কাজ–১ : একজন গর্ভবতী মায়ের যে যে বিষয়ে যত্ন নিতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

কাজ–২ : গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরের যেসব অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায় তা ধারাবাহিকভাবে লেখো।

পাঠ– ৬ : অটিজম (Autism)

দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করি। সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না আমাদের প্রতিদিনের ঘটনা। একটি পরিবারে যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন ঐ পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মা-বাবা শিশুটির সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের পরিকল্পনা করতে থাকে। তাদের এই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ। শিশুদের শারীরিক, মনো-সামাজিক, ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যখন কোনো বাবা-মা বুঝতে পারে যে, তার শিশুটি অন্যান্য সাধারণ শিশুদের থেকে ভিন্ন আচরণ করছে অথবা বিকাশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করছে না বা বয়সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে, তখন তাদের মাঝে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে পরিবারটিতে নেমে আসে হতাশা। সন্তানের এই ভিন্নতাকে মেনে নেওয়ার জন্য মা-বাবাকে প্রথমত সংগ্রাম করতে হয় নিজের মনের সাথে। আবার সেই সাথে শিশুটির প্রতি সমাজের ও পরিবারের সদস্যদের বিরূপ/নেতিবাচক মনোভাবের কারণে মা-বাবাকে প্রতিনিয়তই অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

জন্মের পর শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক (বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, হাতের সূক্ষ্ম কাজ), মানসিক (বুদ্ধি, আবেগ, স্মরণশক্তি, চিন্তা, আচরণ, ব্যক্তিত্ব), সামাজিক ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করাকেই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বলা হয়। আর বিকাশজনিত সমস্যা হলো এমন এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যা শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের সময় ঘটে থাকে এবং শিশুর শরীরের যেকোনো অংশ অথবা সম্পূর্ণ শারীরিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুদের নানা ধরনের বিকাশজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, অটিজম সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি।

অটিজম কী?

অটিজম কোনো রোগ নয়। এটি স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যার একটি বিস্তৃত রূপ যা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার নামে পরিচিত। এখানে 'স্নায়ু' শব্দটি স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্কের সাথে স্নায়ুর সম্পর্ক বোঝায়। 'বিকাশজনিত' শব্দটির মাধ্যমে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

প্রাকশৈশব কাল থেকে এই সমস্যাটি শুরু হয়, যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সাধারণত শিশুর জন্মের দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং আচরণের ভিন্নতাই এই সমস্যাটির প্রধান বিষয়। এছাড়াও অটিজম রয়েছে এমন শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিভিত্তিক, শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সংক্রান্ত সমস্যাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এটা মনে রাখা জরুরি যে, সব অটিস্টিক শিশুই এক রকম নয়। যেমন– অটিজমের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সব অটিস্টিক শিশুর মধ্যে কম-বেশি পরিলক্ষিত হয় আবার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

অটিজম আছে এমন শিশুদের সাধারণ কিছু আচরণ

- চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা
- ডাকলে সাড়া না দেওয়া
- বিকাশজনিত দক্ষতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা
- প্রাত্যহিক রুটিন পরিবর্তনে বাধা দান
- অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা
- আবেগ প্রকাশে অসুবিধা
- অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি
- সত্যিকার বিপদে ভয় না পাওয়া, অন্যদিকে তেমন বিপজ্জনক নয় এমন অবস্থা বা পরিবেশে অস্বাভাবিক ভয় পাওয়া
- অসংগতিপূর্ণ হাসি-কান্না
- কোনো কিছুর প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ
- খাওয়া, ঘুম, মলমূত্র ত্যাগে অস্বাভাবিকতা
- নিজের বা অপরের জন্য বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবহার
- অখাদ্য খাওয়া

অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

অটিজমের বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে আলাদা। মূল শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো—সামাজিক মেলামেশা, যোগাযোগ ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই অটিজমের মূল লক্ষণ হিসেবে পরিচিত। অটিজমের কারণে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অপরের সাথে যোগাযোগ করার কৌশল এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একই ধরনের আচরণ অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের উৎসাহ দেখা যায়। এটা জানা জরুরি যে, অটিজমের লক্ষণগুলো স্নায়বিক কারণে হয় এবং একজনের সাথে আরেকজনের হুবহু মিল নেই।

ক. সামাজিক লক্ষণসমূহ

অটিজম আছে এমন শিশুদের অধিকাংশের মধ্যেই অন্যের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। জীবনের প্রথম কয়েক মাস তারা অন্যের চোখে চোখ রেখে তাকায় না। তারা অন্যের প্রতি নির্লিপ্ত থাকে এবং একা থাকতে পছন্দ করে। তারা অন্যের মনোযোগ পেতে চায় না এবং জড়িয়ে ধরা পছন্দ করে না। তারা অন্যের রাগ বা আদরের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

অটিস্টিক শিশুদের কোনো কিছু শিখতে অনেক সময় লাগে এবং তারা অন্যের চিন্তা ও অনুভূতি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখায় না। সাধারণ ইশারা-ইঙ্গিত যেমন—মুচকি হাসি, চোখ পিট পিট করা বা মৌখিক অভিব্যক্তি তাদের কাছে কম অর্থপূর্ণ বিষয়। এইসব শিশু যারা ইশারা বুঝতে পারে না তাদের কাছে 'এদিকে এসো' বাক্যটি সবসময় একই অর্থ বহন করে। অথচ এই বাক্যটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। দেহভঙ্গি ও মৌখিক অভিব্যক্তি না বোঝার কারণে এসব শিশুর কাছে তার সামাজিক জগৎ বোধহীন হয়ে উঠে।

অটিস্টিক শিশুদের উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠার প্রবণতা তাদের সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যখন তারা অপরিচিত ও বাইরের পরিবেশে যায় তখন তারা রেগে যায় বা হতাশ হয়, আবার তাদের কেউ কেউ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ সময় তারা জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে পারে, অন্যকে আঘাত করতে পারে অথবা নিজের শরীরেও আঘাত করতে পারে।

খ. যোগাযোগের সমস্যা

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষাগত অসুবিধার কারণে অটিস্টিক শিশুদের অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা দেখা দেয়। ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কিছু অটিস্টিক শিশু কখনোই কথা বলতে শেখে না, তারা সারা জীবন নিশ্চুপ থেকে যায়। কোনো কোনো শিশু জন্মের কয়েক মাস পরে বাবলিং বা আধো আধো কথা বলতে শেখে কিন্তু কিছুদিন পর সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। আবার কারো ক্ষেত্রে ভাষা শিখতে ৫ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে অটিস্টিক শিশুরা ছবি, ইশারা ভাষা বা স্পর্শের সাহায্যে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা শিখতে পারে। অটিজম আছে এমন অনেক শিশুর ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। তারা শব্দ বিন্যাস করে সঠিক বাক্য গঠন করতে পারে না, কেউ কেউ একটি শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে, কেউ কেউ যে শব্দটি শোনে সেটিই বারবার বলতে থকে। কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু কোনোএকটি নির্দিষ্ট শব্দ বলে এবং টিয়াপাখির মতো শব্দটি বারবার এক নাগাড়ে বলতে থাকে, যাকে ইকোলালিয়া বলে।

অনেক অটিস্টিক শিশু রয়েছে যাদের ভাষার ক্ষেত্রে খুব সামান্য সমস্যা থাকে। এরা অনেক শব্দ ব্যবহার করে ভালোভাবে কথা বলতে পারে তবে সঠিকভাবে কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারে না। তারা বাক্যের অর্থের তারতম্য বুঝতে পারেনা। আরেকটি বিষয় হলো শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, কণ্ঠস্বর উঠানামার ফলে কথার অর্থের যে ধরনের তারতম্য হয় তা তারা সঠিকভাবে বুঝে না।

গ. পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ

অটিজম আছে এমন শিশুরা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক এবং প্রায় সবারই পেশি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভালো, কিন্তু অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ তাদেরকে অন্য শিশুদের থেকে আলাদা করে রাখে। এই অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ তীব্র থেকে মৃদু হতে পারে। তাদের অনেকেই বারবার হাত নাড়ায়, পায়ের সামনের অংশের উপর ভর দিয়ে হাঁটে, অথবা কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দীর্ঘসময় স্থিরভাবে দাড়িয়ে থাকে। তারা অনেক সময় খেলনা গাড়ি বা ট্রেন দিয়ে খেলা করার বদলে এগুলোকে এক লাইনে সাজায়। যদি অসাবধানতাবশত কেউ তাদের এই সাজানো গাড়ি বা ট্রেন নাড়িয়ে ফেলে তবে তারা খুব হতাশ বা বিচলিত হয়ে পড়ে।

অটিস্টিক শিশুরা চায় তাদের চারপাশের সবকিছু যেমন আছে তেমনই থাকুক। তারা কোনো পরিবর্তন পছন্দ করে না। তাদের দৈনন্দিন রুটিনের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী খাওয়া, গোসল করা, একই রাস্তায় নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সামান্যতম হেরফের হলে তারা খুব বিরক্ত হয়। পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ তাদের আচরণকে আগে থেকেই যুক্ত করে রাখে, যেমন–অটিস্টিক শিশু ফ্যান ঘোরা ও আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘ সময় পার করে দেয় ইত্যাদি। তাদের কারো কারো মধ্যে সংখ্যা, চিহ্ন বা বিজ্ঞান বিষয়ে দারুণ আগ্রহ দেখা যায়।

অটিজমের সাথে সম্পর্কিত কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলি ও সবল দিক

অটিস্টিক শিশুদের কোনো বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা বা ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। এর সংখ্যা অতি নগণ্য তবুও এ ধরনের বিশেষ দক্ষতা তাদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং তাদেরকে করে তুলতে পারে অসাধারণ। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর মধ্যে এ ধরনের বিশেষ প্রতিভা থাকবে। তবে এ বিষয়ে সচেতন থাকলে তাদের সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করা সহজ হবে, শিশুটি সমাজে সমাদৃত হবে এবং তার অন্যান্য দিকের ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ হবে।

অটিস্টিক শিশুরা যে বিষয়টির উপর বেশি মনোযোগ দেয় সে দিকেই তাদের প্রতিভা বিকশিত হতে পারে। দেখা যায় ক্যালেন্ডারের দিকে মনোযোগ আছে এমন শিশুটি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মতারিখ বা বার সঠিকভাবে মনে রাখতে পারে, এভাবে সে একসাথে অনেক তথ্য মনে রাখতে পারে। আবার একটি কঠিন ও কৌশলী কাজকে ছোট ছোট সহজভাগে ভাগ করে এবং সেটার দিকে মনোযোগ দিয়ে তারা সেই কঠিন ও কৌশলী কাজটি সমাধা করতে পারে।

অটিজম আছে এমন শিশুদের কিছু সবল দিক

- সুনিপুণভাবে দেখার ক্ষমতা
- সুশৃঙ্খল নিয়মনীতির ধারণা, সিকোয়েন্স (ধারাবাহিকতা), প্যাটার্ন ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে ও মনে রাখতে পারে
- বিস্তারিত ও মুখস্থ করার মতো বিষয় (গণিত, ট্রেনের সময়সূচি, খেলার স্কোর) মনে রাখতে পারে
- দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা
- সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ
- বিশেষ পছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ
- শৈল্পিক দক্ষতা
- অল্প বয়সে লিখিত ভাষা পড়তে পারা (বুঝতে পারুক বা না পারুক)
- বানান মনে রাখা
- সততা
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা

তোমাদের শ্রেণিকক্ষে অটিস্টিক বন্ধুদের তোমরা কীভাবে সহায়তা প্রদান করতে পার

অটিস্টিক শিশুদের সহপাঠীদের 'সহযোগী বন্ধু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধুত্বের ধারণা এবং লক্ষ্য অর্জনে একতাবদ্ধতার পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে অটিস্টিক শিশুরা যথাযথ সহায়তা, সম্মান নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও ইতিবাচক মানসিকতায় প্রায় সবাই আমরা উপকৃত হব কেননা এদের মধ্যে কেউ আমাদের ভাই, বোন, প্রতিবেশী বা আত্মীয়। অটিজম-সংক্রান্ত শিক্ষা বা সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর উপর ভিত্তি করে হবে না, তা সার্বিকভাবে হতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনা বুঝতে ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে সহপাঠীদের করণীয়

১. এক শ্রেণিকক্ষ থেকে অন্য শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাওয়া।
২. শ্রেণিকক্ষের কাজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণ গুছিয়ে রাখা।
৩. শ্রেণিকক্ষের জন্য নির্ধারিত রুটিন মেনে চলা।
৪. সহপাঠীদের সাথে মেলামেশার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।
৫. শ্রেণিশিক্ষকের পড়ানোর বিষয়টির সারমর্ম বলা এবং মূল বিষয়টি পুনরায় বলা।
৬. শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
৭. মৌখিকভাবে অথবা যোগাযোগ সহায়ক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত উত্তরসমূহ লিখিতভাবে প্রকাশে সাহায্য করা।
৮. হতাশ হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করা।
৯. অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য সর্বদা তাকে পুরস্কৃত করা।
১০. শ্রেণিকক্ষের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

সাধারণত সারাজীবন ধরে অটিজমের লক্ষণগুলো একজনের মধ্যে থাকতে পারে, তবে যথাযথ সাহায্য, নির্দেশনা ও উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সময়ের সঙ্গে কিছু কিছু লক্ষণের উন্নতি হয়। যাদের মাঝে অল্প মাত্রার সমস্যা থাকে তাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় এবং তারা মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। মাঝারি ও বেশি সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, এবং নিজের যত্নও নিতে পারে না। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা পেলে অটিস্টিক শিশুরা নানাক্ষেত্রে সফলতা পেতে পারে।

কাজ–১: অটিজমের লক্ষণগুলো লেখো।
কাজ–২: শ্রেণিকক্ষে অটিস্টিক শিশুদের সাথে সহপাঠীদের কী করণীয় তা বোর্ডে লেখো।

পাঠ-৭ : থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রক্তরোগ। থ্যালাসেমিয়া হলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অনেক কমে যায়। শিশুর জন্মের পর কয়েক মাস বা বছরের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন–ক্লান্তি, অবসাদ, শ্বাসকষ্ট, ফ্যাকাশে ত্বক ইত্যাদি। অধিক হারে লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যাওয়ার ফলে জন্ডিস হতে পারে, প্লীহা এবং যকৃৎও বড় হয়ে যেতে পারে। রোগটির জটিলতা দিন দিন বাড়তে থাকে, শারীরিক বৃদ্ধি প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম থ্যালাসেমিয়াপ্রবণ দেশ। শতকরা ১০-১২ ভাগ মানুষ এই রোগের বাহক; অর্থাৎ প্রায় দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ তাদের অজান্তে এই রোগের বাহক। দুজন থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে সন্তানের এই রোগটি দেখা দিতে পারে। বাহকরা সাধারণত সুস্থ, তাদের তেমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এ কারণে অনেকেই বুঝতে পারে না তিনি থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক।

থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। চিকিৎসার জন্য প্রতি মাসে অনেক টাকা খরচ হয়। সন্তানের চিকিৎসা করাতে রোগীসহ পুরো পরিবার মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৯৭ ভাগ পিতামাতা সন্তানের থ্যালাসেমিয়ার শনাক্ত হওয়ার আগে এই রোগের নাম-ই শোনেননি।

এই রোগীকে নিয়মিত রক্ত দিতে হয়। প্রতিনিয়ত রক্ত জোগার করার অনিশ্চয়তা নিয়ে রোগীরা সবসময় বিচলিত থাকে। লৌহযুক্ত খাবার বা আয়রন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে এ রোগে তেমন উপকার পাওয়া যায় না, বরং জটিলতা বাড়ে। নিয়মিত রক্ত পরিসঞ্চারন ও অন্যান্য চিকিৎসা করা হলেও অনেক রোগী অল্প বয়সে মারা যায়।

থ্যালাসেমিয়া রোগটি অনিরাময়যোগ্য হলেও এটি শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য। জীবনে একটি মাত্র টেস্ট (হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস) করে নিশ্চিত হওয়া যায় কেউ থ্যালাসেমিয়ার রোগের বাহক কি না। দুইজন থেলাসেমিয়া বাহক নারী-পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাদের সন্তানেরও থ্যালাসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ফলে দুই বাহকের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। দুজনের মধ্যে যদি একজন বাহক ও আরেকজন স্বাভাবিক হন তবু তাঁদের সন্তানের বাহক হিসেবে জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় (যেমন: কাজিন)দের মধ্যে বিবাহ হলে থ্যালাসেমিয়া ও এ জাতীয় জিনগত রোগাক্রান্ত সন্তান জন্মদানের ঝুঁকি বেড়ে যায়। উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলে থ্যালাসেমিয়ার মতো বংশগত রোগ নিয়ে আলোচনা করতে অভিবাবকদের মধ্যে অনীহা

কাজ : থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের উপায় লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চাল কোন জাতীয় খাবার?

ক. আমিষ　　খ. শর্করা
গ. স্নেহ　　ঘ. খনিজ

২. মা ও শিশুর অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ কোনটি?

ক. বাল্যবিবাহ　　খ. অজ্ঞতা
গ. ঘন ঘন মা হওয়া　　ঘ. চিকিৎসার অভাব

৩. প্রজনন কী?

ক. গর্ভকালীন বোধ　　খ. গর্ভপাত
গ. নবজাতকের পরিচর্যা　　ঘ. সন্তান জন্মদান

৪. বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের কারণ–

i. পুষ্টির তারতম্য
ii. হরমোন
iii. প্রজনন স্বাস্থ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৫. হরমোনজনিত কারণে কিশোরদের শারীরিক কী পরিবর্তন ঘটে?

ক. শরীর ভারী হয়　　খ. হাড় মোটা হয়
গ. বুক ও কাঁধ চওড়া হয়　　ঘ. উচ্চতা বাড়ে ও ওজন কমে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শফিক সাহেব একজন কৃষক। তার মেয়ে নাফিজা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। অভাবের কারণে তাকে পড়ালেখা করাতে হিমশিম খাচ্ছে। এমন অবস্থায় সে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেন। বছর খানেক পরে তার গর্ভে সন্তান আসে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নাফিজা অসুস্থ থাকে। নাফিজার এই অবস্থা দেখে পাশের বাড়ির স্কুল শিক্ষক বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এলাকার কিছু তরুণ উদ্যোগী হয়ে কর্মসূচিটি সফল করতে কাজ শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে দেখা গেল ৩ বছরের মধ্যে গ্রামে কোনো বাল্যবিবাহ হয় নাই।

৬. নাফিজার এ অবস্থার কারণ কী?

ক. অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ খ. পুষ্টিহীনতা

গ. অজ্ঞতা ও অসচেতনতা ঘ. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

৭. নাফিজাদের মতো মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধকল্পে প্রধান করণীয় কোনটি?

ক. পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণ খ. ব্যাপক প্রসারমূলক কার্যক্রম

গ. মা ও বাবাকে আইন সম্পর্কে জানানো ঘ. বিয়ের বয়স কমিয়ে দেওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শীলা ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। বিষণ্নতার কারণে সে সারাদিন নিজের ঘরে একা থাকে। কোনো কাজে আনন্দ পায় না এবং লেখাপড়ায় অনীহা প্রকাশ করে। ডাক্তারের কাছে নিলে তিনি বলেন, এটা তার রোগ নয়, এ সময়ের সমস্যা।

৮. শীলার এ সময়কালকে কী বলে?

ক. বাল্যকাল খ. যৌবনকাল

গ. বয়ঃসন্ধিকাল ঘ. শিশুকাল

৯. উদ্দীপকে শীলার প্রতি তার বাবা-মায়ের করণীয়–

i. কঠোর শাসন

ii. সহানুভূতিশীল ব্যবহার

iii. বন্ধুত্বসুলভ আচরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ সাহেবের মেয়ে টুসুর জন্মের কয়েক বছর পর দেখলেন যে, স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে তার আচরণ ভিন্ন এবং বয়সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। তাকে ডাকলে সাড়া দেয়না, একই কথা বার বার বলে। সে নিজে যা বুঝে তাই করে। সে সকলের সাথে মিলেমিশে চলতে পারে না।

ক. অটিজম কী?

খ. অটিজম কেন হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. টুসু কী ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. টুসুর আচরণ সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২০২৫

অষ্টম অধ্যায়

দলগত খেলা

খেলাধুলা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য। খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটায় এবং সামাজিক গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করে। খেলাধুলার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি চিত্ত বিনোদনের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা। খেলাধুলা শরীর ও মনকে সতেজ রাখে এবং শরীর গঠনের সাথে সাথে সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। দলের সদস্য হয়ে খেলার ফলে দলীয় আনুগত্য, আইন মেনে চলা, নেতার নির্দেশ পালন করা, শৃঙ্খলাবোধ সমুন্নত বজায় রাখা ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলি অর্জন করার মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি ও ব্যাডমিন্টন খেলার আইন-কানুন বর্ণনা করতে পারব।
- উল্লিখিত খেলার কলাকৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন খেলার বিভিন্ন পজিশনের কী কী যোগ্যতা দরকার তা বর্ণনা করতে পারব।
- খেলার আইন-কানুন মেনে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারব।
- খেলোয়াড়দের যোগ্যতা ও গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে কমপক্ষে একটি খেলায় পারদর্শী হয়ে উঠতে পারব।
- দলগত খেলার মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করতে পারব।
- দলগত খেলার মাধ্যমে নেতৃত্বদানে সক্ষম হব।
- দলগত খেলার মাধ্যমে আইন-কানুন মানা ও শৃঙ্খলাবোধ বৃদ্ধি করতে পারব।

খেলার আইনকানুন

পাঠ–১: ফুটবল : ফুটবল খেলা অতি প্রাচীন। কালের বিবর্তনে এ খেলা বর্তমানে একটি আধুনিক খেলায় পরিণত হয়েছে। আধুনিক ফুটবল খেলার উৎপত্তি ইংল্যান্ডে। ফুটবল খেলার আইন-কানুন প্রণয়ন হয় ইংল্যান্ডেই। এই খেলা জনপ্রিয় হওয়ার কারণে খুব দ্রুততার সাথে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ হলেও ফুটবল খেলা এখানেও কম জনপ্রিয় নয়। ফুটবল খেলায় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার নাম ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা FIFA। ১৯০৪ সালের ২১শে মে প্যারিসে এই সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠনের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় ফুটবল খেলা বিভিন্ন দেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশও ফিফার সদস্যভুক্ত হয়ে এই খেলাকে সারা দেশে জনপ্রিয় করে তুলছে। ফুটবল বর্তমানে বিশ্বে সর্বজনীন খেলা। এ খেলা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭টি আইন আছে। আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন খেলার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে একই নিয়মে বিশ্বের সর্বত্র এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নিচে ফুটবল খেলার আইনগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো–

১. মাঠ : ফুটবল খেলার আইনের প্রথমটি হলো মাঠ। মাঠের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১৩০ গজ, সর্বনিম্ন ১০০ গজ। প্রস্থ সর্বোচ্চ ১০০ গজ, সর্বনিম্ন ৫০ গজ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাঠের মাপ হবে–

ক. দৈর্ঘ্য– ১২০ গজ, প্রস্থ – ৮০ গজ।

খ. দৈর্ঘ্য– ১১৫ গজ, প্রস্থ – ৭৫ গজ।

গ. দৈর্ঘ্য– ১১০ গজ, প্রস্থ – ৭০ গজ।

এই তিনটি মাপের মাঠের যে কোনো একটি মাঠ আন্তর্জাতিক, জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য প্রযোজ্য। তবে স্কুলের ছোট ছেলেদের জন্য দৈর্ঘ্য ১০০ গজ ও প্রস্থ ৫০ গজ নেওয়া যেতে পারে।

১.১ দাগ : প্রত্যেকটি দাগ চওড়া হবে ৫ ইঞ্চি। মাঠের দৈর্ঘ্যের দাগকে টাচ লাইন ও প্রস্থের দাগকে গোল লাইন বলে।

১.২ গোল এরিয়া : দুই গোল পোস্টের উভয় দিকে ৬ গজ এবং সামনের দিকে ৬ গজ নিয়ে উভয় দাগকে একটি সরলরেখা দ্বারা যোগ করতে হবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ২০ গজ। এই দাগের ভিতরের জায়গাকে গোল এরিয়া বলে।

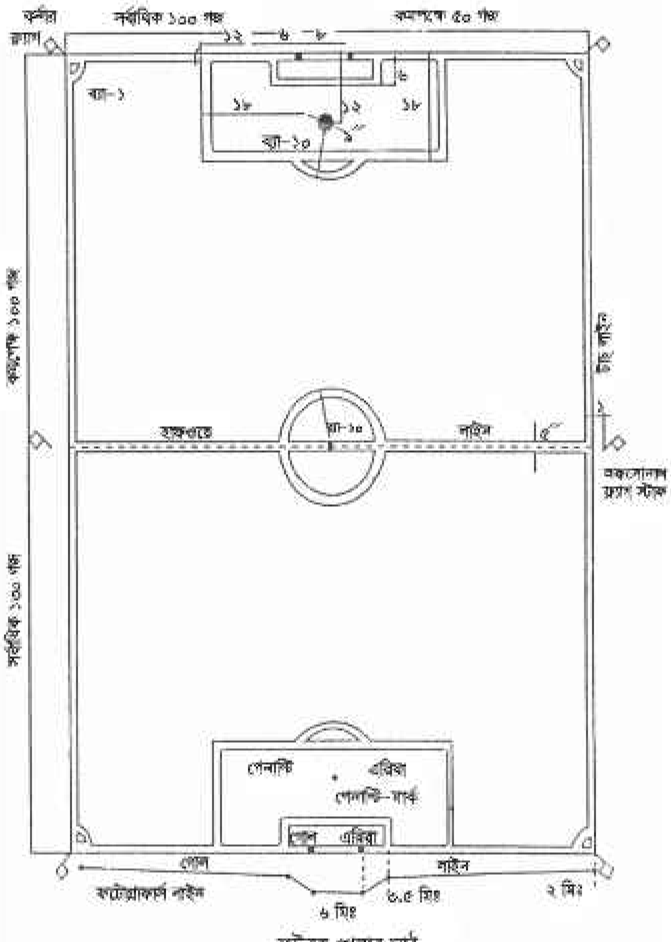

ফুটবল খেলার মাঠ

১.৩ পেনাল্টি এরিয়া : গোল পোস্টের উভয় দিকে ১৮ গজ এবং সামনের দিকেও ১৮ গজ নিয়ে একটি সরলরেখা টানতে হবে যার দৈর্ঘ্য হবে ৪৪ গজ। এই ভিতরের আয়তাকার এরিয়াকে পেনাল্টি এরিয়া বলে।

১.৪ পেনাল্টি মার্ক : যে চিহ্নতে বল বসিয়ে পেনাল্টি কিক মারা হয় তাকে পেনাল্টি মার্ক বলে। দুই গোল পোস্টের মাঝ থেকে সামনের দিকে ১২ গজ দূরে চিহ্ন দিতে হবে যার ব্যাস হবে ৯"।

১.৫ কর্নার পতাকা : মাঠের চার কোনায় ৪টি পতাকা থাকবে। পতাকা দণ্ডের উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট হবে। পোস্টের মাথা চোখা হবে না এবং মাথায় পতাকা লাগানো থাকবে। মাঠের মধ্যরেখার দুইদিকে টাচ লাইন থেকে ১ গজ দূরে দুটি পতাকা থাকবে। একে ঐচ্ছিক পতাকা বলে।

১.৬ কর্নার এরিয়া : কর্নার পতাকাদণ্ড থেকে ১ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ আঁকতে হবে। যার মধ্যে বল বসিয়ে কর্নার কিক মারতে হয়।

১.৭ : গোল পোস্ট : মাটি থেকে ক্রসবারের নিচ পর্যন্ত উচ্চতা ৮ ফুট ও দুই গোল পোস্টের মাঝের দূরত্ব ৮ গজ হবে। গোল পোস্টের পিছনে জাল টাঙাতে হবে। জাল এমনভাবে টাঙাতে হবে যেন গোলকিপারের চলাফেরায় কোনো অসুবিধে না হয়।

১.৮ সেন্টার সার্কেল : মধ্যরেখার মাঝখান থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে যাকে সেন্টার সার্কেল বলে।

২. খেলার বল : বল গোলাকার হবে। চামড়া বা ঐ জাতীয় বস্তু দ্বারা তৈরি হবে। হাওয়া দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে।

৩. খেলোয়াড়ের সংখ্যা : একটি দল ১৮ জন খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত হবে। ১১ জন মাঠে খেলবে বাকি ৭ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে মাঠের বাইরে থাকবে। তবে আঞ্চলিক বা আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

৪. খেলোয়াড়দের সরঞ্জাম : একজন খেলোয়াড়ের বাধ্যতামূলক পোশাক হচ্ছে শার্ট বা জার্সি, শর্টস বা হাফ প্যান্ট, মোজা, শিনগার্ড ও বুট। অন্য খেলোয়াড়ের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে এমন কোনো বস্তু বা পোশাক পরা যাবে না।

৫. রেফারি : খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি থাকেন।

৬. ডেপুটি রেফারি : রেফারিকে সাহায্য করার জন্য ২ জন ডেপুটি রেফারি থাকেন। এছাড়া মাঠের বাইরে একজন চতুর্থ রেফারি থাকেন। তিনিও খেলা পরিচালনার ব্যাপারে রেফারি কে সাহায্য করেন।

৭. খেলার সময় : আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে খেলার সময় প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট, মাঝে বিরতি ১৫ মিনিট।

৮. খেলা আরম্ভ : খেলা আরম্ভের সময় উভয় দলের খেলোয়াড়গণ নিজ নিজ অর্ধে অবস্থান করেন। রেফারির সংকেতের সাথে সাথে কিক অফের মাধ্যমে খেলা শুরু হয়।

৯. বল খেলার মধ্যে ও বাইরে : বল গড়িয়ে বা শূন্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে গোল লাইন বা টাচলাইন যখন অতিক্রম করে তখন সে বলকে খেলার বাইরে ধরা হয়। বল দাগের উপরে থাকলে খেলার মধ্যে গণ্য হবে।

১০. গোল হওয়া : বল শূন্যে বা মাটি দিয়ে গড়িয়ে দুই পোস্টের ও বারের নিচ দিয়ে গোল লাইন সম্পূর্ণ অতিক্রম করলে গোল হয়েছে বলে ধরা হবে।

১১. অফ সাইড : বল ছাড়া কোনো খেলোয়াড় যদি বিপক্ষের অর্ধে অবস্থান করে এবং তার সামনে বিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় না থাকে ঐ অবস্থায় যদি সে নিজ দলের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল পায় তাহলে অফ সাইড হবে।

১২. ফাউল ও অসদাচরণ : ফাউল বা অসদাচরণ হলে দু ধরনের কিক দেওয়া হয়। ক. ডাইরেক্ট ফ্রি কিক, খ. ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক। নিচের ১০টি অপরাধের জন্য প্রত্যক্ষ বা ডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়া হয়–

১. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে লাথি মারা বা লাথি মারার চেস্টা করা।

২. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ল্যাং মারা।

৩. বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উপর লাফানো।

৪. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আক্রমণ করা।

৫. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা।

৬. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধাক্কা মারা।

৭. বল খেলার পূর্বে বিপক্ষের খেলোয়াড়ের সাথে সংঘর্ষ করা।

৮. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধরে রাখা।

৯. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে থুতু মারা।

১০. বল হাত দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ধরা, বহন করা, আঘাত করা বা সামনে চালিত করা। গোলকিপারের জন্য এই নিয়ম পেনাল্টি এরিয়ার ভিতর প্রযোজ্য নয়।

নিম্নের অপরাধগুলোর জন্য পরোক্ষ ফ্রি কিক দেওয়া হয়–

ক. এমনভাবে খেলা যা রেফারির নিকট বিপজ্জনক বলে মনে হয়।

খ. বল আয়ত্তে না থাকা অবস্থায় কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দেওয়া।

গ. গোলরক্ষক বল ছুড়ে দেওয়ার সময় তাকে বাধা দেওয়া।

ঘ. বল নিজে খেলছে না অহেতুক অপরকে বাধা দেওয়া।

ঙ. গোলরক্ষককে আক্রমণ করা, গোলরক্ষক যখন তার সীমানার মধ্যে থাকে।

চ. গোলরক্ষক বল ছেড়ে দেওয়ার পর অন্য খেলোয়াড় টাচ করার পূর্বেই পুনরায় টাচ করা।

ছ. গোলরক্ষক ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করলে।

১৩. ফ্রি কিক : যে কিকে সরাসরি গোল হয় তাকে প্রত্যক্ষ ফ্রি কিক বলে। যে কিকে সরাসরি গোল হয় না তাকে পরোক্ষ ফ্রি কিক বলে।

১৪. পেনাল্টি কিক : পেনাল্টি এরিয়ার ভিতর রক্ষণভাগের কোনো খেলোয়াড় উক্ত ১০টি অপরাধের যে কোনো একটি করে তাহলে বিপক্ষ দল একটি পেনাল্টি কিক পাবে। তবে গোলকিপারের জন্য ডাইরেক্ট ফ্রি কিক-এর ১০ নং নিয়মটি প্রযোজ্য নয়।

১৫. থ্রোয়িং : কোনো খেলোয়াড়ের স্পর্শে বল টাচ লাইন সম্পূর্ণ অতিক্রম করলে বিপক্ষ দল ঐ স্থান থেকে নিয়মানুযায়ী মাঠের মধ্যে বল নিক্ষেপের মাধ্যমে খেলা শুরু করে ঐ নিক্ষেপকে থ্রোয়িং বলে।

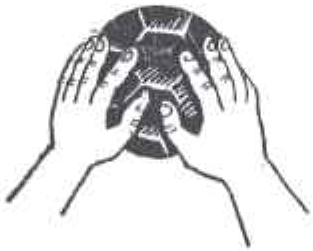

থ্রোয়িং

১৬. গোল কিক : দুই গোল পোস্ট বাদে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের স্পর্শে যখন বল গোল লাইন অতিক্রম করে তখন যে কিকের মাধ্যমে খেলা শুরু হয় তাকে গোল কিক বলে।

১৭. কর্নার কিক : কোনো খেলোয়াড় গোলপোস্ট বাদে বল যখন নিজ গোল লাইন অতিক্রম করে তখন বিপক্ষ দল একটি কর্নার কিক পায়।

কলাকৌশল : ফুটবল হচ্ছে গতির খেলা, প্রচণ্ড শারীরিক সামর্থ্যের ও শৈলীর খেলা। ইংরেজিতে যাকে বলে Speed, Stamina ও Skill এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে ঘটলে সে ভালো খেলোয়াড় হয়ে উঠবে। ফুটবল খেলার মৌলিক কলাকৌশলসমূহ যথা– ১. কিকিং, ২. হেডিং, ৩. ড্রিবলিং, ৪. ট্র্যাপিং, ৫. ট্যাকলিং, ৬. গোলকিপিং।

১. কিকিং : ফুটবল পায়ের খেলা। পায়ের সাহায্যে বলের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে ফুটবল খেলার প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করা যায়। পায়ের তিনটি দিক রয়েছে—পায়ের ভিতরের দিক (Inside), পায়ের বাইরের দিক (Outside) এবং পায়ের পাতার উপরের দিকে (Instep)। কিক করার সময় পায়ের এসব অংশ ব্যবহার করতে হয়। পায়ের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বিভিন্নভাবে কিক মারা যায়। তবে ইনসাইড কিক সহজ ও সঠিকভাবে করা যায় এবং কাছাকাছি হলে এই কিকের মাধ্যমে বল পাস দেওয়া যায়। অনেক সময় ডানদিকের খেলোয়াড়ের কাছে বল পাস দেওয়ার সময় আউটসাইড কিক ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ পায়ের পাতার বাইরের অংশ দিয়ে পাস দেওয়া। সোজা ও মাটি ঘেঁষে বল পাঠানোর জন্য বাম পা বলের বামপাশে স্থাপন করে

দৃষ্টি বলের উপর রেখে ডান পায়ের পাতার উপরের অংশ দিয়ে বলের মাঝ বরাবর জোরে আঘাত করতে হবে। হাত দুটো প্রসারিত করে শরীরের ভারসাম্য রাখতে হবে। কিকিং ফুট সামনে দিকে যাবে। বল উঁচুতে পাঠাতে হলে বলের নিচের দিকে কিক করতে হবে।

কিকিং

২. হেডিং : হেড করার সময় মনে রাখতে হবে বলকে কপালের সাহায্যে আঘাত করতে হবে। হেড করার নিয়ম–

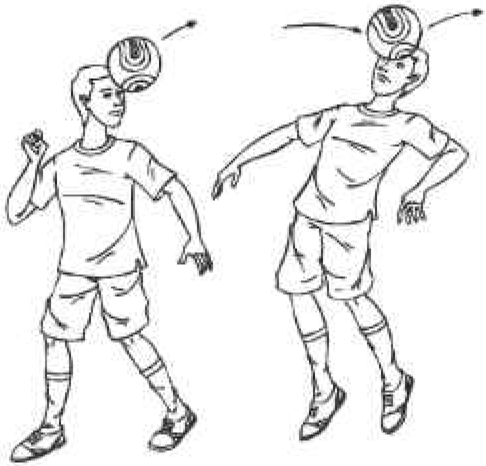

হেডিং

ক. চুলের নিচে কপালের চ্যাপ্টা অংশ দিয়ে হেড করতে হয়।

খ. বলের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

গ. শরীরের উপরের অংশ পিছনের দিকে এনে কপাল দিয়ে আঘাত করতে হবে।

ঘ. হাত দুটো সামান্য প্রসারিত থাকবে।

ঙ. ডানে বামে যে দিকেই হেড করা হোক না কেন কপাল দিয়েই হেড করতে হবে শুধু মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে বল পাঠাতে হবে।

৩. ড্রিবলিং : পায়ে পায়ে বলকে গড়িয়ে নেওয়াকে ড্রিবলিং বলে। সতীর্থকে সঠিকভাবে বল জোগান দেওয়ার জন্য ড্রিবলিং করা হয়। ড্রিবলিং দু রকমের–

ক. পায়ের কাছাকাছি বল রেখে ড্রিবলিং : এই ড্রিবলিং এর সময় দুপায়ের ভিতরের অংশ ব্যবহার করে ড্রিবল করা হয়।

খ. বল সামান্য দূরে রেখে ড্রিবল : এই প্রকার ড্রিবলিং সাধারণত দ্রুততার জন্য করা হয়। বল সামনে বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত দৌড়িয়ে পুনরায় আয়ত্তে আনা।

৪. ট্র্যাপিং : হাত ছাড়া শরীরের যেকোনো অংশ দিয়ে বলকে আয়ত্তে আনা বা থামানোকে ট্র্যাপিং বলে। ট্র্যাপিং বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন–

ক. সোল ট্র্যাপ (Sole trap)

খ. শিন ট্র্যাপ (Shin trap)

গ. থাই ট্র্যাপ (Thigh trap)

ঘ. চেস্ট ট্র্যাপ (Chest trap)

ঙ. হেড ট্র্যাপ (Head trap)

ক. সোল ট্র্যাপ : মাটিতে গড়ানো বল পায়ের তলা দিয়ে থামানোকে সোল ট্র্যাপ বলে।

খ. শিন ট্র্যাপ : উঁচু বল মাটিতে ড্রপ খাওয়ার পর শিন দিয়ে বল থামানোকে শিনট্র্যাপ বলে।

গ. থাই ট্র্যাপ : উপরের বল থাই দিয়ে থামিয়ে নিচে ফেলাকে থাই ট্র্যাপ বলে। বল থাই স্পর্শ করার সাথে সাথে থাই নিচের দিকে টানতে হবে। তাহলে বলের গতি কমে সামনে পড়বে।

ট্র্যাপিং

ঘ. চেস্ট ট্র্যাপ : উঁচু বল বুক দিয়ে থামানোকে বোঝায়। বল টাচ করার সাথে সাথে বুক ভিতরের দিকে টানতে হবে তাহলে বলের গতি থেমে সামনে পড়বে।

ঙ. হেড ট্র্যাপ : কপাল দিয়ে বল ঠেকিয়ে সামনে ফেলাকে হেড ট্র্যাপ বলে। মাথা পিছনের দিকে বাঁকাতে হবে এবং বল টাচ করার সাথে সাথে পিছনের দিকে নিতে হবে।

৫. ট্যাকলিং : ট্যাকলিং ফুটবল খেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাত্মক কৌশল। এই কৌশলের সাহায্যে বিপক্ষের নিকট থেকে বলকে কেড়ে নেওয়া যায়। বিপক্ষের নিকট থেকে বলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার নামই ট্যাকলিং।

৬. গোলকিপিং : ফুটবল খেলায় গোলকিপারের দায়িত্ব অনেক বেশি। গোলকিপার শরীরের যেকোনো অংশ দিয়ে বল থামাতে পারে। হাত দিয়ে বল ধরা বা থামানোই প্রধান। যেমন–

গোলকিপিং

ক. নিচু বল ধরা : কেবল মাটি দিয়ে গড়িয়ে আসে বা সামান্য উপর দিয়ে আসে সে বলকে এক পা সামনে ও অপর পা পিছনে দিয়ে হাঁটু ভেঙে কোমর থেকে উপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে বলটির পিছনে যেয়ে দু হাত দিয়ে বল ধরে বুকের কাছে আনতে হবে।

খ. কোমর সমান উঁচু বল ধরা : প্রথমে বলের লাইনে যেতে হবে। দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে, দু হাত বলের নিচে দিয়ে জড়িয়ে বুকের সাথে আটকিয়ে রাখতে হবে।

গ. মাথার উপরের বল ধরা : উঁচু বল ধরার সময় লাফিয়ে বলের পিছনে গিয়ে দু হাত সামনে উপরের দিকে প্রসারিত করে দু হাতের তালু বলের পিছনে রেখে বল ধরবে। এছাড়াও যে সমস্ত বল আয়ত্তের বাইরে সেগুলোকে ধরার চেষ্টা না করে পাঞ্চ করে সরিয়ে দিতে হবে।

কাজ–১ : একটি আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল খেলার মাঠ অঙ্কন করে বিভিন্ন এরিয়ার মাপগুলো উপস্থাপন করো।

কাজ–২ : পায়ের পাতার বিভিন্ন অংশগুলোর ছবি এঁকে দেখাও ও নাম বলো।

কাজ–৩ : কপালের কোন অংশ দিয়ে হেড করতে হয় ব্যবহারিক ক্লাসে প্রদর্শন করে দেখাও।

পাঠ–২ : ক্রিকেট : ক্রিকেট খেলার জন্ম ইংল্যান্ডে। একে 'রাজার খেলা' নামেও অভিহিত করা হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক, দিনব্যাপী খেলা, দুপুরের খাবার, বিকেলের চা-নাশতা, নিয়ম-কানুনের মধ্যে ভদ্র আচরণ এসব কিছু মিলে একে অভিজাত খেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। ক্রিকেট খেলার বিপুল জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে এর নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, প্রচার, ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতি বিষয়ের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিটির প্রয়োজন অনুভূত হয়। টেস্ট খেলুড়ে দেশ যথা– ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান এসব দেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯০৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আই.সি.সি গঠিত হয়। ক্রিকেটের বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এই কমিটি। এই ৭টি দেশের পর শ্রীলংকা, জিম্বাবুয়ে ও বাংলাদেশ টেস্ট খেলার মর্যাদা লাভ করেছে।

ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন : ক্রিকেট খেলার আইন ৪২টি। তবে নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি আইনের বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. পিচ : পিচের দৈর্ঘ্য ২২ গজ, প্রস্থ ১০ ফুট। পিচের দুই মাথায় তিনটি করে স্টাম্প থাকে। স্টাম্পের উচ্চতা ২৮", তিন স্টাম্পের প্রস্থ ৯"। স্টাম্পের মাথার উপর দুইটি বেল বসানো থাকে। বেলসহ স্টাম্পের উচ্চতা ২৮ $\frac{১}{২}''$।

২. ক্রিকেট মাঠ : স্টাম্পের মাঝখান থেকে নিচের উভয় পার্শ্বে কমপক্ষে ৬০ গজ থেকে ৭৫ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি অর্ধবৃত্ত আঁকতে হবে। পরে দুই দাগের মাথা সোজা করে রেখা দ্বারা সংযোগ করে দিলেই বাউন্ডারি লাইন হয়ে যাবে। একে ওভাল সাইজ মাঠ বলে। আবার পিচের মাঝখান থেকে ৬০-৭৫ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে বাউন্ডারি লাইন টানা যায়। একে রাউন্ড সাইজ মাঠ বলে।

মাঠে খেলোয়াড়দের অবস্থান

৩. খেলোয়াড় : দেশের মাটিতে খেলা হলে ১৪ জন এবং বিদেশের মাটিতে হলে ১৫ জন খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়। এদের মধ্যে ১১ জন মাঠে খেলায় অংশগ্রহণ করে। অবশিষ্ট ৩ বা ৪ জন খেলোয়াড় অতিরিক্ত হিসেবে থাকে। অতিরিক্ত খেলোয়াড় শুধু ফিল্ডিং করতে পারে। কিন্তু ব্যাটিং, বোলিং ও উইকেট কিপিং করতে পারবে না।

৪. বল : বল গোলাকার হবে। বলের পরিধি হবে ৮$\frac{৩}{৪}''$ – ৯"। খেলার পূর্বে বল আম্পায়ার ও উভয়দলের ক্যাপটেন দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

৫. ব্যাট : ব্যাটের দৈর্ঘ্য ৩৮ ইঞ্চির বেশি নয়, প্রস্থ ৪ $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চির বেশি হবে না।

৬. মাঠে খেলোয়াড়দের অবস্থান : একটি দল মাঠে ফিল্ডিং করার সময় বিভিন্ন অবস্থানে দাঁড়াতে হয়। এটা নির্ভর করে বোলারের বোলিং কৌশলের উপর। প্রতি দলে ১১ জন খেলোয়াড় থাকে। তাই ফিল্ডিং করার সময় ১১ জন খেলোয়াড়কে ১১টি স্থানে দাঁড়াতে হয়। তবে মাঠে এর চেয়ে অনেক বেশি অবস্থান রয়েছে। এই অবস্থানগুলি নিম্নরূপ–

থার্ড ম্যান, ডিপ ফাইন লেগ, লং লেগ, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, সেকেন্ড স্লিপ, থার্ড স্লিপ, ফার্স্ট স্লিপ, লেগ স্লিপ, স্কয়ার লেগ, গালি, কভার পয়েন্ট, শর্ট একস্ট্রা কভার, সিলি মিড অফ, সিলি মিড অন, শর্ট লেগ, একস্ট্রা কভার, মিড অফ, মিড অন, মিড উইকেট, লং অফ, লং অন।

৭. ওভার : ৬টি শুদ্ধ বলে এক ওভার হয়।

৮. বাউন্ডারি : ব্যাটে বল লেগে মাটি স্পর্শ করে যখন বাউন্ডারি রেখা অতিক্রম করে তখন তাকে বাউন্ডারি বলে। বাউন্ডারি হলে ব্যাটসম্যানের নামে ৪ রান যোগ হয়।

৯. ওভার বাউন্ডারি : ব্যাটের আঘাতে বল যখন শূন্যে দিয়ে বাউন্ডারি রেখা অতিক্রম করে তখন তাকে ওভার বাউন্ডারি বলে। ওভার বাউন্ডারি হলে ব্যাটসম্যানের নামে ৬ রান যোগ হয়। বল বাউন্ডারি রেখার উপরে পড়লেও ওভার বাউন্ডারি হিসেবে গণ্য হবে।

১০. বাই এবং লেগ বাই : বল যদি ব্যাটসম্যানের ব্যাটের বা দেহের কোথাও স্পর্শ না করে অতিক্রম করে এবং কোনো রান সংগৃহীত হয় তবে আম্পায়ার বাই এবং বল যদি ব্যাটম্যানের ব্যাট বাদে দেহের বা পোশাকের কোনো অংশ স্পর্শ করে অতিক্রম করে ও কোনো রান সংগৃহীত হয় তবে লেগ বাই এর সংকেত দিবেন।

১১. নো-বল : বোলার নিয়ম-মাফিক বল না করলে নো-বল হয়। নিম্নের কারণগুলোর জন্য নো-বল ডাকা হয়–

ক. বোলারের কনুই ভেঙে গেলে।

খ. ডেলিভারির স্ট্রাইড (পদক্ষেপ) পপিং ক্রিজ অতিক্রম করলে।

গ. বোলার বল করার সময় উইকেটের কোনো ক্ষতি করলে।

ঘ. বল পিচের অর্ধেকের এপাশে পড়লে।

ঙ. বল সরাসরি ব্যাটসম্যানের কাঁধের উপর দিয়ে চলে গেলে।

চ. নিয়মমাফিক ফিল্ডার অবস্থান না করলে।

১২. ওয়াইড বল : বল ব্যাটসম্যানের খেলার নাগালের বাইরে দিয়ে গেলে ওয়াইড বল হয়। তবে টেস্ট খেলা ও একদিনের খেলার ওয়াইড বলের মধ্যে দূরত্বের পার্থক্য আছে।

একজন ব্যাটসম্যান কী কী কারণে আউট হয়–

১৩. রান আউট : রান নেওয়ার সময় ব্যাটসম্যান যদি ক্রিজে পৌঁছার আগেই ফিল্ডারগণ বল দ্বারা বেল ফেলে দেয় তখন ব্যাটসম্যান রান আউটের আওতায় পড়বে।

১৪. এল.বি.ডব্লিউ : আম্পায়ার যদি মনে করেন যে লেগস্টাম্পের বাইরে বল ছাড়া কোনো বল ব্যাটসম্যানের পায়ে বা শরীরে প্রতিহত না হলে সরাসরি স্টাম্পে আঘাত করত তবে তিনি ব্যাটসম্যানকে LBW হিসেবে আউট করে দিবেন।

১৫. বোল্ড আউট : বোলারের বল সরাসরি বা ব্যাটের আঘাতে স্টাম্পে লেগে বেল পড়ে যায় তাহলে ব্যাটসম্যান আউট হবে। একে বোল্ড আউট বলে।

১৬. কট আউট : ব্যাটসম্যান বল মারার পর বল শূন্যে থাকা অবস্থায় ফিল্ডারগণ বল ধরে ফেললে তখন ঐ ব্যাটসম্যান আউট হবে। এই আউটকে কট আউট বলে।

১৭. স্টাম্পড আউট : নো বল ছাড়া ব্যাটসম্যান বল খেলার জন্য ক্রিজ ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ সময় যদি উইকেট কিপার বল ধরে বেল ফেলে দেয় অথবা উইকেট ভেঙে দেয় তাহলে ব্যাটসম্যান স্টাম্পড আউট হবে।

১৮. টাইমড আউট : একজন ব্যাটসম্যানকে আউট হওয়ার পর নতুন ব্যাটসম্যান গার্ড নিতে ৩ মিনিটের বেশি সময় নেয় তখন ঐ ব্যাটসম্যান টাইমড আউটের আওতায় পড়বে। টি টোয়েন্টি খেলার এই সময় ১ ১/২ মিনিট হবে।

১৯. হিট উইকেট : ব্যাটসম্যান বল খেলার সময় যদি শরীর, ব্যাট বা পোশাকে লেগে বেল পড়ে যায় অথবা উইকেট ভেঙে যায় তখন ব্যাটসম্যান হিট উইকেট আউট হবে।

২০. হিট দ্য বল টোয়াইস : ব্যাটসম্যানের ব্যাটে বা শরীরে বল একবার লাগার পর ব্যাটসম্যান নিজের উইকেট রক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার বলে আঘাত করলে বা খেললে আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আউটের আওতায় পড়বে।

২১. ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল ধরা : ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দ্বারা বল ধরলে বা খেললে বা বাধা প্রদান করলে ঐ ব্যাটসম্যান আউট হবে।

২২. ফিল্ডারদের বল ধরতে বাধা প্রদান : ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে ফিল্ডারদের বল ধরতে বাধা প্রদান করলে ঐ ব্যাটসম্যান আউট হবে।

২৩. শতক ও অর্ধশতক : একজন ব্যাটসম্যান বল খেলে ১০০ রান করলে শতক বা সেঞ্চুরি এবং ৫০ রান করলে অর্ধশতক বা হাফ সেঞ্চুরি হয়।

২৪. মেডেন ওভার : একজন বোলার এক ওভারে কোনো রান না দিলে তাকে মেডেন ওভার বলে। সে ওভারে কোনো উইকেট পেলে তাকে মেডেন উইকেট বলে।

কলাকৌশল : ক্রিকেট খেলায় কলাকৌশলকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. ব্যাটিং, খ. বোলিং, গ. ফিল্ডিং ও ক্যাচিং, ঘ. উইকেট কিপিং

ক. ব্যাটিং : ব্যাটিং-এর প্রাথমিক কলাকৌশলের মধ্যে রয়েছে—গ্রিপ, স্ট্যান্স, ব্যাকলিফট, স্ট্রোক, গ্ল্যান্স, ড্রাইভ ও হুক। এই সমস্ত কলাকৌশল একজন ব্যাটসম্যান সঠিকভাবে প্রয়োগ করে দর্শকদের সহজে আনন্দ দিতে পারে। ব্যাটসম্যান এই কৌশলগুলো প্রদর্শন করে দ্রুত রান নিয়ে কিংবা দর্শনীয় মারের সাহায্যে বাউন্ডারি মেরে দর্শকদের আনন্দে উত্তেজনায় মাতিয়ে তুলতে সক্ষম হয়।

১. গ্রিপ : ব্যাটিং-এ গ্রিপ গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক গ্রিপ উইকেটের উভয় দিকে স্ট্রোক খেলতে সাহায্য করে। একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান ব্যাটের হাতলের উপরিভাগ বাম হাতে এবং নিচের অংশ ডান হাতে ধরবে। হাত দুটি পাশাপাশি থেকে উভয় হাতের আঙুল ও বুড়ো আঙুল দিয়ে হাতলটিতে ভালোভাবে আটকিয়ে ধরবে। এতে উভয় হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দেখাবে।

২. স্ট্যান্স : একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান পপিং ক্রিজের দুদিকের দু পা অর্থাৎ ডান পা ক্রিজের মধ্যে এবং বাম পা বাইরে বোলারের দিকে থাকবে। দু পায়ের উপর ভর রেখে সহজ ও স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে হবে। বাম হাত থাকবে বাম উরুর উপর এবং বাম কাঁধ ও চোখের দৃষ্টি বোলারের দিকে থাকবে।

৩. পিছনে ব্যাট উঠানো বা ব্যাক লিফট : পিছনে ব্যাট তোলা ব্যাটিং-এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় দৃষ্টি বলের দিকে এবং বাম কাঁধ ও কনুই বোলারের দিকে থাকবে।

৪. স্ট্রোক বা বল মারা : বলের ধরন অনুযায়ী ব্যাটসম্যানকে বিভিন্ন প্রকার স্ট্রোক খেলতে হয়। এই স্ট্রোক কখনো আক্রমণাত্মক আবার কখনো রক্ষণাত্মক। সামনে এগিয়ে যখন আত্মরক্ষামূলক খেলা হয় তখন তাকে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ স্ট্রোক বলে। এ সময় বাম পা সামনে এগিয়ে যাবে এবং ব্যাট মাটিতে ৩০° থেকে ৪০° কোণ হবে। এ সময় মাটি ও ব্যাটের অবস্থান ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দেখাবে। আবার পিছনে অর্থাৎ উইকেটের দিকে সরে গিয়েও রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলা যায়। একে ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ স্ট্রোক বলে।

৫. ড্রাইভ : সজোরে আক্রমণাত্মক খেলা খুবই দর্শনীয় হয়। পপিং ক্রিজের বাইরে বাম পা এগিয়ে নিয়ে ব্যাট ডানে উপরে উঠিয়ে সজোরে বলে আঘাত করে বল দূরে পাঠিয়ে দেওয়াকে ফরোয়ার্ড ড্রাইভ বলে।

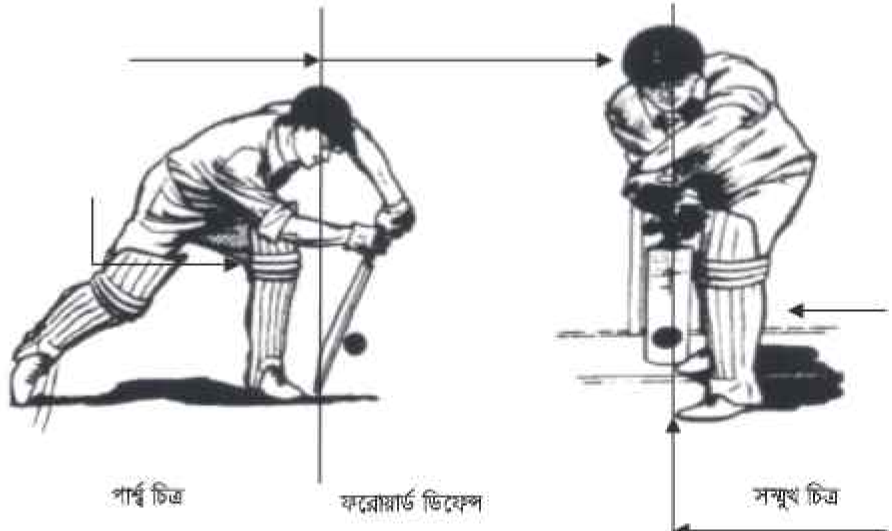

৬. হুক শট : বোলার যখন শর্টপিচ বল করে তখন বল ব্যাটসম্যান থেকে বেশ কিছুটা দূরে পড়ে লাফিয়ে উঠে। এই লাফিয়ে উঠা বলকে একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান তার ডানপায়ের উপর ভর করে ব্যাট শূন্যে ঘুরিয়ে আঘাত করে এবং বল তার অনসাইডে যায়। হুকশটের জন্য ব্যাটসম্যানের দৃষ্টি, পা ও হাতের কব্জি খুব দ্রুত চালাতে হয়। তবে হুকশট খুবই বিপজ্জনক। দক্ষতা না থাকলে এই শট না নেওয়াই ভালো।

৭. কাট শট : বোলার যদি শট বল করে তাহলে সামনের পা বাড়িয়ে দিয়ে অথবা পিছনের পা ভিতরে দিয়ে বল কাট করা যায়। যারা খেলা শিখছে তাদের জন্য এই কৌশলটি প্রথমে আয়ত্ত করতে যাওয়া ঠিক নয়। এই শটে বল নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অফ স্টাম্পের ২ ফুট বাইরে দিয়ে যাওয়া বলের লাইন ঠিক করে ব্যাট চালাতে হয়।

৮. লেগ গ্লান্স : এই স্ট্রোকে হাতের কব্জি ও হাতকে খুব জোরের সাথে ব্যবহার করতে হয়। ব্যাট করা বল সাধারণত স্কয়ার লেগ ও ফাইনলেগ অঞ্চল দিয়ে বেরিয়ে যায়। লেগ গ্লান্স দু ভাবে হয়—প্রথম সামনের বাড়িয়ে দেওয়া পা থেকে, আর দ্বিতীয় পা উইকেটের দিকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে গ্লান্স করতে হয়। ব্যাটসম্যানের বাম পায়ের সামনে বা একটু বাইরে বল পড়লে ডান পা মিডল স্টাম্পের দিকে একটু ঘুরে বলে গ্লান্স করতে হয়।

খ. বোলিং : বোলিং ক্রিকেটের অন্যতম প্রধান কৌশল। উঁচুমানের বোলিং-এ ব্যাটসম্যান ব্যাটিংয়ে তেমন সুবিধা

২০১৫

করতে পারে না। অনেক সময় আক্রমণাত্মক বোলিং-এ ব্যাটসম্যান দ্রুত আউট হয়ে যায় এবং এর ফলে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা সহজ হয়। বোলিং-এর প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কলাকৌশল নিচে বর্ণনা করা হলো–

১. বলের উপর সঠিক গ্রিপ : কোন ধরনের বল করা হবে তার উপর নির্ভর করে বলের গ্রিপে তারতম্য হয়। ফাস্ট বল ও স্পিন বলের গ্রিপ এক রকম হয় না। তবে যেকোনো ধরনের বল হোক না কেন বলের গ্রিপ নিতে হবে আঙুলের সাহায্যে, হাতের তালু দিয়ে নয়। এতে বল বোলারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২. রান আপ : বোলার দৌড়ে এসে বোলিং ক্রিজ থেকে ব্যাটসম্যানের উদ্দেশে বল করে। এই দৌড়ে আসার প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দৌড়ানোর ফলে হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার বলের গতি বৃদ্ধি পায়। গতি সম্পন্ন বলে অনেক ব্যাটসম্যান স্বাচ্ছন্দে খেলতে পারে না। রান আপে পায়ের পাতা ব্যবহার করতে হয় এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বারবার দৌড়ে এসে পায়ের পদক্ষেপ ঠিক করে নিতে হয়। এ সময় শরীরের ভারসাম্য একটু সামনে ঝুঁকানো থাকে।

৩. ডেলিভারি : রান আপের শেষ পর্যায়ে এসে হাত থেকে বল ছেড়ে দেওয়াকে ডেলিভারি বলে। একজন ডানহাতি বোলারকে বলের ডেলিভারির পূর্ব মুহূর্তে বাম পায়ের উপর লাফ দিয়ে শরীরকে পাশের দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে এবং এর সাথে ডান পা সামনে, ডান হাত মুখের কাছাকাছি, বাম হাত সোজা উপরের দিকে ও চোখের দৃষ্টি ব্যাটসম্যানের উপর থাকতে হবে।

৪. ফলো-থ্রু : বল হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ফলো-থ্রু করতে হয়। বল ছাড়ার পরপরই শরীর দ্রুত ঘুরে যায়, ডান কাঁধ থাকে ব্যাটসম্যানের দিকে। ডান হাত বাম পায়ের পাশ দিয়ে পিছনের দিকে যেতে থাকে। দৃষ্টি থাকে পিচের উপর যেখানে বল পড়ছে। এ সময় কয়েক পদক্ষেপ সামনে যেতে হয়।

ফাস্ট বোলিং গ্রিপ

ফাস্ট বোলিং

১. ফাস্ট বোলিং ইন স্যুইং : দ্রুতগতির বল বা ফাস্ট বোলিং-এ ইন স্যুইং বল করা সহজ। কিন্তু দূরত্ব ও বলের নিশানা ঠিক রেখে বারবার বল করা মোটেই সহজ নয়। দূরত্ব ও নিশানা ঠিক না থাকলে ঐ বোলারকে অনেক রান দিতে হয়। ইন স্যুইং বলের বৈশিষ্ট্য হলো বল অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে পড়ে দ্রুত উইকেটের দিকে ছুটে যায়। এই বলের গ্রিপে বলের সেলাই তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের মাঝে থাকে। বুড়ো আঙুল, কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙুলের গোড়ায় বলটি ধরতে হবে। বলটি এভাবে ধরার উদ্দেশ্য হলো বলের ডেলিভারির সময় বলের সেলাই লেগ স্লিপের দিকে মুখ করে থাকে। ডেলিভারির সময় ডান হাত অনেক উপরে এবং বাম হাত স্বাভাবিকভাবে নিচের দিকে থাকে। ইন স্যুইং বলে শর্ট লেগে দাঁড়ানো ফিল্ডারের কাছে ক্যাচ উঠে।

২. ফাস্ট বোলিং আউট স্যুইং : বলের গ্রিপ ইন স্যুইং বলের মতো তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে বলের সেলাইকে মাঝে রেখে ধরতে হয় এবং বলের নিচে অন্য ৩টি আঙুল থাকে। তবে বলের ডেলিভারির সময় বলের সেলাই প্রথম স্লিপের ফিল্ডারের দিকে মুখ করে থাকে।

স্পিন বোলিং

১. লেগ স্পিন : এখানে স্পিন বোলিং মূলত দু প্রকারের, সাইড স্পিন ও টপ স্পিন। সাইড স্পিন বোলিং-এ বল ঘড়ির কাঁটার মতো কিংবা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে। একজন ডানহাতি স্পিন বোলার যখন একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যানকে স্পিন বোলিং করে এবং বল ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরতে ঘুরতে যায় তাহলে সে বল লেগ ব্রেক করে। আবার ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে ঘুরে গিয়ে পিচে পড়লে সে বল অফ ব্রেক করে। টপ স্পিন হচ্ছে লেগ ব্রেক ও অফ ব্রেকের সমন্বয়। স্পিন বোলিং-এ বল ডেলিভারির সময় কব্জি বাহুর সমকোণে অবস্থান করে। লেগ স্পিন বোলিং-এ মোটামুটি লেগ স্টাম্পের বরাবরে গিয়ে পিচের উপর পড়ে এবং তারপর গতি পরিবর্তন করে অফ স্টাম্পের দিকে ছুটে যায়। লেগ স্পিনে বলের গ্রিপ তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঙুলের মাঝে থাকে, বুড়ো আঙুল বল আটকে থাকতে সাহায্য করে। বল ডেলিভারির সময় বাম কাঁধ খুব উঁচু থাকবে না। কব্জি থাকে ঢিলে অবস্থায় এবং তৃতীয় আঙুল বল স্পিনের কাজ করে।

২. অফস্পিন– অফ স্পিন বোলিং-এ প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুল বলের সেলাইয়ের উপর একটু ফাঁক রেখে থাকবে। বুড়ো আঙ্গুল বলের সেলাই বরাবর এবং অপর দু টি আঙুল নিচে পরস্পর লেগে থাকবে। তর্জনী বা প্রথম আঙ্গুল বলের সেলাইয়ের উপর নিচের দিকে টান দিয়ে বলটি ঘুরাবে। অফস্পিন বল অবশ্যই ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরবে অর্থাৎ বাম থেকে ডানে ঘুরবে। দরজার নব যেমন ঘুরিয়ে দরজা খুলতে গেলে হাতের কব্জি যে কাজ করে, অফ স্পিন বোলিং-এ কব্জি ঠিক সেভাবে ঘুরবে।

৩. গুগলি– লেগস্পিন বোলার একই গ্রিপে যদি অফস্পিন ডেলিভারি দেয় তাকে গুগলি বলে।

গ. ফিল্ডিং ও ক্যাচিং– ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং ও বোলিং-এর ন্যায় ফিল্ডিংও সমান চিত্তাকর্ষক এবং খেলার জয় পরাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফিল্ডিং-এ যখন কোনো ব্যাটসম্যানকে কট আউট করা হয় তখন তার ক্যাচ ধরায় দর্শক আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ভালো ফিল্ডার হতে হয়। ফিল্ডিং-এ ক্যাপটেন বা বোলারের ইচ্ছেমতো ফিল্ডারদের দাঁড়াতে হয়। ফিল্ডিং থেকে সংগৃহীত বল সব সময় উইকেট কিপারের কাছে ফেরত পাঠাতে হয়। ফিল্ডিং-এ ক্যাচিং একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ব্যাটসম্যানের উঠিয়ে দেওয়া বল ধরার জন্য ফিল্ডারকে বলের লাইনের নিচে যেতে হবে। দৃষ্টি বলের উপর থাকবে। দু'হাত খুলে আঙ্গুলগুলো পাশাপাশি রাখতে হবে। হাতের আঙুল ও তালু নমনীয় থাকবে। বল হাতে স্পর্শ লাগার সাথে সাথে হাত বুকের কাছে টেনে আনতে হবে এবং আঙুল বন্ধ করে ফেলতে হবে। বল ক্যাচিং ছাড়া মাঠে গড়িয়ে যাওয়া বলও ফিল্ডারকে থামাতে, কুড়িয়ে নিতে ও থ্রো করতে হয়।

থ্রোয়িং : আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং-এ দ্রুত ও সঠিকভাবে থ্রো করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে একজন ভালো ব্যাটসম্যানকে রান আউট করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, এতে ব্যাটিং সাইডের রান রেট কমে আসে। ভালো থ্রো করতে হলে নমনীয় কব্জি, হাত ও কাঁধ ব্যবহার করতে হয়। থ্রোয়িং কৌশলের মধ্যে বল হাতের মধ্যে আসার পর কেবল থ্রোয়িং করার উদ্যোগ নিতে হয়। একটু আগে বা পরে হলে বল যেমন ধরা যায় না তেমনি থ্রোও করা যায় না। থ্রো করার সময় কব্জি, হাত, কাঁধ, দু পা-এর সমন্বিত কার্যক্রম দরকার।

ঘ. উইকেট কিপিং : মাঠে খেলোয়াড়দের যত রকমের অবস্থান আছে, তার মধ্যে উইকেট কিপিং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দল গঠনের সময় সেরা উইকেট কিপারকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি, দ্রুত প্রতিক্রিয়া, শক্তিশালী হাত, শারীরিক শক্তি ও সাহসের অধিকারী হতে হয়। এটা সাধারণভাবে বিবেচনা করা হয় যে, একজন উইকেট কিপার জন্মায় কিন্তু তাকে তৈরি করা যায় না। উইকেট কিপারের সাজসরঞ্জাম অন্য খেলোয়াড়দের থেকে

আলাদা। উইকেট কিপিং-এ প্যাড, গ্লাভস, ইনার গ্লাভস, ক্যাপস, গার্ডস, জুতা এই সাজসরঞ্জামগুলো প্রয়োজন। ব্যাটসম্যানের মতো উইকেট কিপারকেও স্ট্যান্স নিতে হয়। কারণ তাকে বোলারের কিংবা ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে আসা বল ধরার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। উইকেটের পিছনে পা ফাঁক করে দু পায়ের উপর সমান ভারসাম্য রেখে দাঁড়াতে বা অর্ধ বসার ভঙ্গিতে থাকতে হয়। দেহকে নিচু করে দৃষ্টিকে উইকেটের উপরের লাইনে রাখতে হবে। বাম পা থাকবে মধ্য উইকেটের লাইনে, হাত দুটো পাশাপাশি একসাথে, আঙুল নিচের দিকে এবং দৃষ্টি বলের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে।

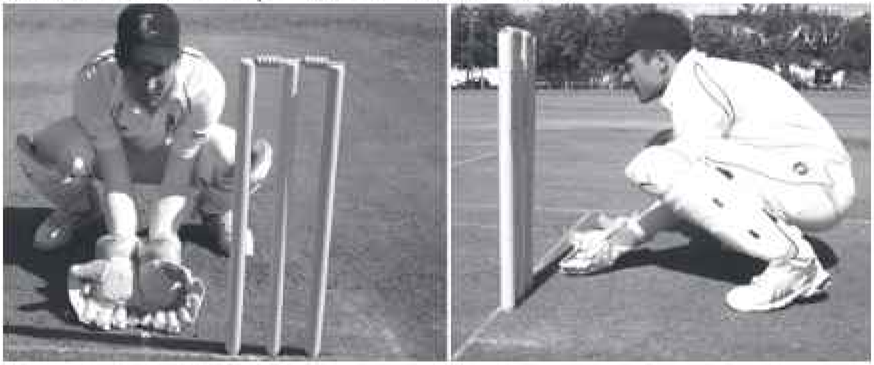

উইকেট কিপিং

কাজ–১ : ফাস্ট বলের গ্রিপ ও স্পিন বলের গ্রিপের পার্থক্যগুলো বলো এবং করে দেখাও।

কাজ–২ : ব্যাটসম্যানের স্ট্যান্স মাঠে প্রদর্শন করো।

কাজ–৩ : ফাস্ট বল ও স্পিন বলের সময় উইকেট কিপারের পজিশন দেখাও।

পাঠ–৩ : ব্যাডমিন্টন : ব্যাডমিন্টন খেলার উৎপত্তি নিয়ে বহুমত থাকলেও অধিকাংশ মানুষের ধারণা এ খেলার জন্ম হয়েছে ভারতের পুনেতে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পুনেয় অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যরা স্থানীয় লোকজনদেরকে শাটলকক ও ছোট ব্যাট দিয়ে খেলতে দেখে কৌতূহলবোধ করেন। তারা ছুটিতে ইংল্যান্ডে যেয়ে খেলাটি প্রচলন করেন। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে ঐ খেলা শিখে ভারতে কর্মরত ইংরেজ সৈন্যরা ছুটিতে বাড়ি গিয়ে ব্যাডমিন্টন নামক জায়গায় একত্র হয়ে খেলাটি শুরু করেন। সে থেকে এ জায়গার নাম অনুসারে ব্যাডমিন্টন খেলার নামকরণ হয়। পরবর্তীকালে দেশে দেশে এ খেলার প্রচলনের ফলে সকল বয়সের ও শ্রেণির নারী-পুরুষ ব্যাডমিন্টন খেলায় জড়িয়ে পড়ে।

ক. খেলার কোর্ট : কোর্টের মেঝে কাঠের হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে তা কোনোভাবেই পিচ্ছিল হতে পারবে না। শাটল সাদা রঙের তাই কোর্টের মেঝে গাঢ় রঙের হবে কিন্তু চকচকে হতে পারবে না। মেঝের রং সাদা ব্যতীত হালকা রঙের হলে কোর্টের দাগ হবে কালো রঙের, অন্যথায় এর রং হবে সাদা। ব্যাডমিন্টন খেলা সিঙ্গলস ও ডাবলসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গেলস কোর্ট– দৈর্ঘ্য ৪৪ ফুট, প্রস্থ ১৭ ফুট। ডাবলস কোর্ট– দৈর্ঘ্য ৪৪ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট। কোর্টের দু টি পার্শ্বরেখায় দুই মধ্যবিন্দু বরাবর ব্যাডমিন্টন নেট টাঙানোর জন্য দু টি খুঁটি বসবে। এই বিন্দু থেকে উভয় দিকে প্রান্তরেখার সমান্তরালে (৬´৬´´) দূরে লাইন টানতে হবে। একে শর্ট সার্ভিস লাইন বলে। আবার উভয় প্রান্তরেখার থেকে কোর্টের অভ্যন্তরে ২´৬´´ দূরে প্রান্তরেখার সমান্তরালে দু টি লাইন টানতে হবে। একে দ্বৈত খেলার জন্য লং সার্ভিস লাইন বলে। শর্ট সার্ভিস

লাইন দ্বারা বিভক্ত দু দিকের দু টি কোর্টের মাঝ বরাবর পার্শ্বরেখার সমান্তরালে দু টি লাইন টেনে রাইট সার্ভিস কোর্ট ও লেফট সার্ভিস কোর্ট নামে দু টি কোর্ট তৈরি করতে হবে। কোর্টের সকল মার্কিং বা দাগ ৪ সেন্টিমিটার চওড়া হবে।

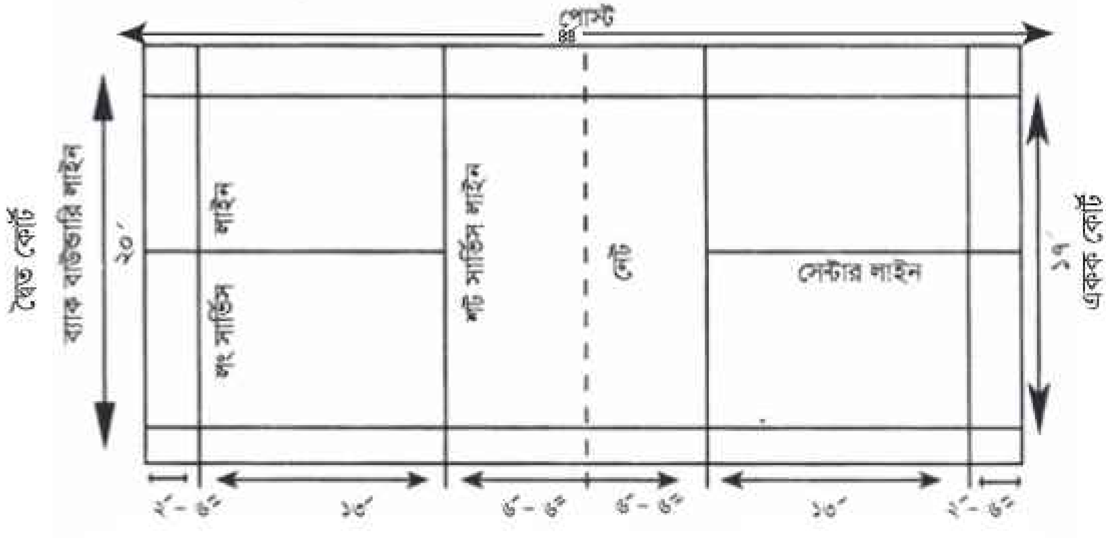

ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্ট একক ও দ্বৈত

খ. খেলার সরঞ্জাম

১. পোস্ট বা খুঁটি : খুঁটির উচ্চতা মেঝে থেকে ৫´–১´ হবে।

২. নেট : নেটের দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট এবং প্রস্থ ২ ফুট ৬ ইঞ্চি হবে। মেঝে থেকে নেটের দু পোস্টের দিকে উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি এবং মাঝখানে মেঝে থেকে ৫ ফুট। নেটের উপরের প্রান্ত ৩ ইঞ্চি চওড়া একটি সাদা ফিতা দিয়ে দু দিকে মুড়ে দিতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে শক্ত দড়ি বা তার চলে গিয়ে দু'দিকের খুঁটির মাথায় যুক্ত হবে।

৩. র‍্যাকেট : ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের হাতলের দৈর্ঘ্য ২৬ ইঞ্চি। র‍্যাকেটের মাথায় নেট থাকে। নেটগুলো টানটান অবস্থায় থাকবে।

৪. শাটল কক : হাঁসের পালক দ্বারা শাটল কক তৈরি হয়। সকল পালক সুতা দ্বারা গাঁথা থাকে। পিছনের রেখার উপর থেকে একজন খেলোয়াড় যখন খুব জোরে উপরের দিকে র‍্যাকেট দিয়ে শাটল ককে আঘাত করে এবং সেই শাটল কক যদি বিপক্ষ কোর্টের লং সার্ভিস লাইনের কাছাকাছি গিয়ে পড়ে তখনই এই শাটল কক মানসম্পন্ন বলে ধরা হয়।

ব্যাডমিন্টন খেলার নিয়মাবলি

১. টস : যে খেলোয়াড় বা দল টসে জয়লাভ করবে সে খেলোয়াড় বা সে দল সার্ভিস অথবা কোর্ট নেবে।

২. পয়েন্ট : একক ও দ্বৈত খেলায় ২১ পয়েন্টে গেম সম্পন্ন হবে। তবে ২ পয়েন্টের ব্যবধান থাকতে হবে।

যেমন– ১৯–২১, ২০–২২ পয়েন্ট এইভাবে। কিন্তু ৩০ পয়েন্টের উপরে যেতে পারবে না। যে আগে ৩০ পয়েন্ট পাবে সে বিজয়ী হবে। তৃতীয় সেটে ১১ পয়েন্ট হলে প্রান্ত বদল করতে হয়।

৩. সার্ভিস : মহিলা ও পুরুষ এককের খেলায় যে দোষ করবে সে সার্ভিস হারাবে। পুরুষ ও মহিলা ডাবলসের খেলায় যে দল প্রথম সার্ভিস করবে সে দল প্রথমবার সেকেন্ড হ্যান্ড সার্ভিস পাবে না। দোষ করলে বিপক্ষ দল সার্ভিস পাবে। সার্ভিস কোনাকুনি কোর্টে করতে হয়।

৪. সার্ভিস ফল্ট : নিম্নলিখিত কারণে সার্ভিস ফল্ট হয়–

ক. শাটলটি কোনাকুনি কোর্টে না পড়লে।

খ. সার্ভিসের সময় কোর্ট থেকে যেকোনো পা শূন্যে উঠে গেলে।

গ. শাটলটি শর্ট সার্ভিস এরিয়ায় বা লং সার্ভিস এরিয়ায় পড়লে।

ঘ. শাটল কোর্টের বাইরে পড়লে।

ঙ. শাটলটি হাত থেকে ছেড়ে সার্ভিস না করলে।

চ. শাটলটি কোমরের উপরে তুলে সার্ভিস করলে।

ছ. শাটলটি যদি নেটে আটকে যায়।

জ. সার্ভিস করার সময় কোর্টের দাগ স্পর্শ করলে।

ঝ. সার্ভিসকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধোঁকা দিলে।

৫. লেট : খেলা চলাকালীন খেলার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনো দৈব দুর্ঘটনার কারণে স্বাভাবিক খেলা বন্ধ হলে আম্পায়ার লেট ঘোষণা করবেন। যেমন–রিসিভার প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই সার্ভিস করলে কিংবা উভয় খেলোয়াড় একসঙ্গে আইন ভঙ্গ করলে।

৬. ব্যাডমিন্টনে ৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়–

ক. পুরুষ একক, খ. পুরুষ দ্বৈত, গ. মহিলা একক, ঘ. মহিলা দ্বৈত, ঙ. মিশ্র দ্বৈত।

৭. খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি, একজন আম্পায়ার, একজন স্কোরার ও দুই বা চারজন লাইন জাজ থাকবে।

ব্যাডমিন্টন খেলার কলাকৌশল : ব্যাডমিন্টন খেলার কলাকৌশলকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. গ্রিপ, ২. ফুটওয়ার্ক, ৩. সার্ভিস, ৪. স্ট্রোক ও স্ম্যাশিং

১. গ্রিপ বা র‍্যাকেট ধরা : র‍্যাকেট ব্যবহারের প্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে র‍্যাকেট ধরা। র‍্যাকেট ধরার ক্ষেত্রে কব্জির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ফোরহ্যান্ড ও ব্যাকহ্যান্ড শর্ট নেওয়ার সময় গ্রিপের তারতম্য হয়ে থাকে। এজন্য গ্রিপকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. ফোরহ্যান্ড গ্রিপ।

খ. ব্যাকহ্যান্ড গ্রিপ।

ক. ফোরহ্যান্ড গ্রিপ : একজন ডানহাতি খেলোয়াড় তার ডানদিক দিয়ে যে শটগুলো খেলে তা সবই ফোরহ্যান্ড গ্রিপের অন্তর্ভুক্ত। ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে র‍্যাকেটের গোড়া এমনভাবে ধরতে হবে যেন ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দেখায়।

খ. ব্যাকহ্যান্ড গ্রিপ : ডানহাতি খেলোয়াড় তার শরীরের বামপাশে যে শটগুলো খেলে তা ব্যাকহ্যান্ড গ্রিপের অবস্থান থেকে হাতটি বাম দিকে এমনভাবে ঘুরাতে হবে যেন হাতের বুড়ো আঙুল র‍্যাকেটের পিছনে আড়াআড়ি ও কোনাকুনি অবস্থানে থাকে। র‍্যাকেটের হাতলের শেষ অংশটুকু হাতের তালুর মধ্যে থাকবে।

২. ফুটওয়ার্ক বা পায়ের কাজ : দ্রুত স্ট্রোক নেওয়ার জন্য চমৎকার ফুটওয়ার্ক প্রয়োজন। স্ট্রোকের প্রয়োজনে সামনে, পিছনে, পাশে পা ফেলে, লাফ দিয়ে কিংবা দৌড়ে গিয়ে খেলতে গেলে ফুটওয়ার্ক ভালো হতে হয়। সার্ভিস করা বা সার্ভিস রিসিভ করার সময় একজন ডানহাতি খেলোয়াড়কে বাম পা আগে, ডান পা সামান্য পিছনে এবং হাঁটু সামান্য ভেঙে দাঁড়াতে হয়। শরীরের ওজন পায়ের পাতার উপর থাকে। দু পা ১৪" থেকে ১৮" দূরত্বে থাকবে। একে স্ট্যান্স বলে। এছাড়া এক পা পিভটিং করে এবং অন্য পা স্থির রেখেও ফুটওয়ার্ক করা হয়।

৩. সার্ভিস : একজন ভালো খেলোয়াড়কে তিন ধরনের সার্ভিসের কৌশল জানতে হয়।

ক. হাইডিপ সার্ভিস, খ. লো-সার্ভিস, গ. ড্রাইভ সার্ভিস

ক. হাইডিপ সার্ভিস : যখন খুব উঁচু দিয়ে শাটল খাড়াভাবে বিপক্ষ কোর্টের লং সার্ভিস লাইনের কাছে ফেলা হয় তাকে হাইডিপ সার্ভিস বলা হয়। এর উচ্চতা অনেক সময় ২০ বা তারও বেশি হয়ে থাকে। একক খেলায় ফোরহ্যান্ড গ্রিপ ব্যবহার করে এই সার্ভিস করা হয়।

খ. লো-সার্ভিস : শাটল যখন খুব নিচু দিয়ে বিপক্ষের সার্ভিস এলাকার শর্ট সার্ভিস লাইন দ্বারা যুক্ত কোনায় ফেলা হয় তখন একে লো-সার্ভিস বলা হয়। র‍্যাকেটটি তখন ফোরহ্যান্ড গ্রিপে ধরা থাকে।

গ. ড্রাইভ সার্ভিস : নিচু দিয়ে সজোরে শাটলটি পিছনে বা সার্ভিস গ্রহণকারীর ডানদিক বরাবর সার্ভিস করলে অনেক সময় ভালো ফল দেয়। সজোরে এই সার্ভিসটি করা হয় বলে একে ড্রাইভ সার্ভিস বলে।

৪. স্ট্রোক ও স্ম্যাশিং : স্ট্রোক বা আঘাত করার কৌশলকে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো–

ক. ফোরহ্যান্ড স্ট্রোক : ডানহাতি খেলোয়াড়ের বাম পা বা কাঁধ নেটের দিকে থাকবে এবং শরীরের ডান পাশ দিয়ে শাটলে আঘাত করতে হবে। র‍্যাকেট পিছনে নেওয়ার সময় ডান পায়ের উপর দেহের ভর থাকবে। শাটলে আঘাত করার সাথে সাথে শরীরের ওজন ডান পা থেকে বাম পায়ের উপর চলে আসবে।

খ. ব্যাকহ্যান্ড শট : ডানহাতি খেলোয়াড়ের শরীরের বাম পাশ দিয়ে শাটলে আঘাত করতে হবে। এজন্য ডান কাঁধ ও ডান পা নেটের দিকে থাকবে।

গ. ওভারহ্যান্ড শট : প্রথমত বাম পা সামনে রেখে ডান পায়ের উপর শরীরের ওজন রাখতে হবে। শট নেওয়ার সময় শাটলের দিকে চোখ রেখে শরীর পিছনের দিকে একটু ঝুঁকে যাবে এবং মাথার উপর দিয়ে পিছন দিক দিয়ে র‍্যাকেট তুলে এনে শাটলে আঘাত করতে হবে।

ঘ. ড্রপ শট : এ শটের কৌশল হচ্ছে শাটল নেটের সামান্য উপর দিয়ে নেট পার হয়ে বিপক্ষ কোর্টে গিয়ে পড়বে।

ঙ. আন্ডারহ্যান্ড ড্রপ শট : সার্ভিস করার সময় র‍্যাকেট সুইং করে শাটলে লাগার সাথে সাথে র‍্যাকেটের গতি রোধ করতে হবে।

চ. স্ম্যাশিং : মাথার উপর শট নেওয়ার কৌশলে র‍্যাকেট ধরা হাতটি পিছন থেকে সুইং করে উপরে উঠবে এবং যে মুহূর্তে র‍্যাকেট শাটল স্পর্শ করতে যাচ্ছে তখনই হাতের কব্জি নিচের দিক করে সজোরে শাটলে আঘাত করতে হবে। এর ফলে শাটলটি দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাবে এবং বিপক্ষের কোর্টে গিয়ে আছড়ে পড়বে। খেলোয়াড় লাফিয়ে উঠেও স্ম্যাশ করতে পারে।

> কাজ–১ : ব্যাডমিন্টন কোর্টটি অঙ্কন করে দেখাও।
>
> কাজ–২ : ব্যবহারিক ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের গ্রিপের কৌশলগুলো প্রদর্শন করো।
>
> কাজ–৩ : সার্ভিসের ফল্টগুলো এক দল বলবে ও অপর দল ভুল হলে শুধরে দিবে।

পাঠ–৪: ভলিবল : ভলিবল একটি দলগত খেলা। খোলা জায়গায় কিংবা জিমন্যাশিয়ামে সকল বয়সের নারী-পুরুষ ভলিবল খেলতে পারে। এই আনন্দপূর্ণ খেলাটির উদ্ভব ঘটে আমেরিকায়। ১৮৯৫ সালে হলিউডের ওয়াই.এম.সি.এ কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক উইলিয়াম জি. মরগ্যান এ খেলা আবিষ্কার করেন। ১৮৯৬ সালে আমেরিকার স্প্রিং ফিল্ড কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষকরাই এ খেলার ধরন অনেকটা ভলি-এর মতো দেখে এর নাম ভলিবল রাখেন। ১৯৪৭ সালের ২০ এপ্রিল ফ্রান্সের পল লিবার্ড-এর প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। তখন থেকে বাংলাদেশে ভলিবল খেলার প্রসার ও জনপ্রিয় করতে এই ফেডারেশন কাজ করে আসছে।

ভলিবল খেলার আইনকানুন–

ক. খেলার কোর্ট

১. খেলার কোর্ট : খেলার কোর্ট হবে একটি আয়তক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ যথাক্রমে ১৮ মিটার × ৯ মিটার। কোর্টের মেঝে থেকে ৭ মিটার উচ্চতার মধ্যে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

২. বাউন্ডারি লাইন : কোর্টের চতুর্দিকের সীমানা ৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাউন্ডারি লাইন দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। বাউন্ডারি লাইন থেকে চারদিকে ২ মিটার বিস্তৃত স্থান প্রতিবন্ধকতা মুক্ত থাকতে হবে।

৩. সেন্টার লাইন : কোর্টের দুই পার্শ্বরেখাকে সমান দু ভাগে ভাগ করে একটি রেখা টেনে দু দিকে যুক্ত করতে হবে। এই রেখাটি ভলিবল নেটের সরাসরি নিচে হবে এবং দুভাগে বিভক্ত করবে।

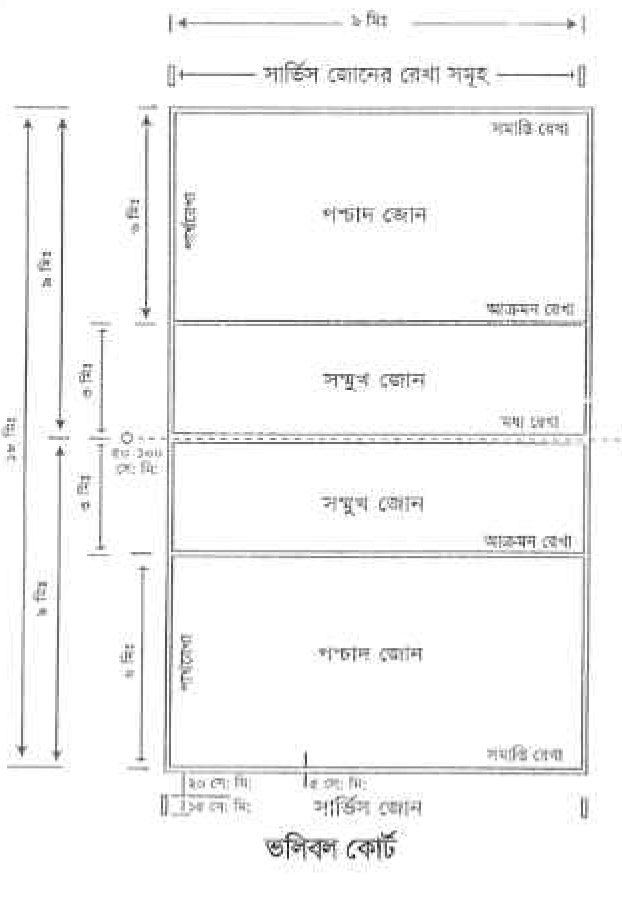

ভলিবল কোর্ট

৪. এ্যাটাক এরিয়া : মধ্য লাইনের সমান্তরালে মধ্য লাইন থেকে ৩ মি. দূরে একটি লাইন টানতে হবে যার দু'প্রান্ত দুই পার্শ্বের লাইনের সাথে গিয়ে মিশবে। মধ্য লাইন বা মধ্যরেখা দ্বারা বিভক্ত দু টি কোর্টে ২টি অ্যাটাক এরিয়া তৈরি হবে, এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে যথাক্রমে ৯ মিটার × ৩ মিটার।

৫. সার্ভিস এরিয়া : ব্যাক লাইনের পিছনে পুরো জায়গা এবং ব্যাক লাইন থেকে ২০ সে.মি. ফাঁক রেখে ১৫ সে.মি. দাগ দিতে হবে। এর ভিতরের জায়গাকে সার্ভিস এরিয়া বলে।

৬. তাপমাত্রা : যদি ইনডোর কোর্ট হয় তাহলে কোর্টের তাপমাত্রা ১০° সেলসিয়াস অথবা ৫০° ফারেনহাইটের নিচে হবে না।

খ. নেট

১. মাপ ও গঠন : নেটের দৈর্ঘ্য ৯.৫ মিটার এবং প্রস্থ ১ মিটার হবে। নেটের প্রতিটি ঘর ১০ সেন্টিমিটার বর্গাকার হবে। নেটের উপরের প্রান্তদেশ ৫ সেন্টিমিটার চওড়া সাদা ক্যানভাস কাপড় দ্বারা দু ভাঁজ করে মোড়া থাকবে। এই ক্যানভাসের মধ্য দিয়ে নমনীয় তার বা রশি ঢুকিয়ে নেটের উপরের প্রান্তদেশ সোজা টানা অবস্থায় রাখতে হবে।

২. নেটের উচ্চতা : নেটের মাঝামাঝি জায়গায় ভূমি থেকে শীর্ষদেশের উচ্চতা পুরুষদের জন্য ২.৪৩ মিটার, মহিলাদের জন্য ২.২৪ মিটার হবে।

৩. সাইড মার্কার ও অ্যান্টেনা : সাইড লাইন ও সেন্টার লাইনের সংযোগস্থলে ৫ সেন্টিমিটার চওড়া একটি সাদা ফিতা নেটের সাথে লম্বভাবে ঝুলানো থাকবে যা প্রয়োজনে সরানো যায়। ফাইবার গ্লাস বা অনুরূপ কোনো বস্তু দিয়ে তৈরি ২টি অ্যান্টেনা পাশের সাদা ফিতার উপরে লম্বভাবে দুই দিকে বেঁধে দিতে হবে।

গ. বল, খেলোয়াড় ও খেলোয়াড়দের সরঞ্জাম

১. বল : বল গোলাকার ও নরম চামড়া দিয়ে তৈরি হবে। ভিতরে নরম ব্লাডার থাকবে। বলের পরিধি ৬৭ সে.মি. হবে।

২. দল : প্রতি দল ১২ জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হবে। খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে একজন ক্যাপটেন নিয়োজিত থাকবে। তার বুকের বাম পার্শ্বে একটি প্রতীক চিহ্ন বা ফিতা লাগাতে হবে।

৩. খেলোয়াড়দের সাজসরঞ্জাম : জার্সি, শর্টস এবং হিল ছাড়া হালকা নমনীয় জুতা হচ্ছে খেলার পোশাক। সকল খেলোয়াড়ের একই রঙের পোশাক থাকবে। জার্সির সামনে ও পিছনে জার্সি থেকে ভিন্ন রঙের একই নম্বর হবে।

৪. কোর্টে খেলোয়াড়দের অবস্থান : কোর্টে ৬ জন খেলোয়াড় অবস্থান নেবে। ৩ জন থাকবে অ্যাটাক এরিয়ায়, অপর ৩ জন পিছনের কোর্টে। খেলা শুরুর আগে খেলোয়াড়দের অবস্থান ও রোটেশন সম্পর্কে আম্পায়ারকে তথ্য দিতে হবে যাতে এই রোটেশন গেম বা সেট সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বজায় থাকে। তবে প্রতি সেট শুরুর আগে রোটেশন অর্ডার পরিবর্তন করা যায়।

ঘ. খেলা

১. খেলার প্রস্তুতি ও টস : কোর্টে খেলোয়াড় প্রবেশের পূর্বে রেফারি দুই অধিনায়কের উপস্থিতিতে টস করবেন এবং টসে জয়ী অধিনায়ক সার্ভিস বা কোর্ট পছন্দ করবে। এরপর খেলোয়াড়েরা ৩ মিনিট ওয়ার্ম আপ অনুশীলন করতে পারবে। বদলি খেলোয়াড় ও কোচ রেফারির বিপরীতে নির্দিষ্ট জায়গায় বসবে।

২. রোটেশন : ৬ জন খেলোয়াড় ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘোরে সেভাবে রোটেশন করবে। বিপক্ষ দলের সার্ভিস নষ্ট হওয়ার পর যখন অপর দল সার্ভিস করবে তখন এই রোটেশন সম্পন্ন করতে হবে। রোটেশনে ভুল হলে রেফারি প্রয়োজনীয় শাস্তির বিধান করবেন।

৩. টাইম আউট : বল যখন খেলার বাইরে যায় অর্থাৎ ডেড হয় তখন কোচ বা ক্যাপটেনের অনুরোধে রেফারি টাইম আউট দিতে পারেন। প্রতিটি খেলায় একটি দল সর্বাধিক দু টি টাইম আউট এবং ৬ জন খেলোয়াড় পরিবর্তনের জন্য সাময়িক বিরতি নিতে পারে। টাইম আউটের সময় খেলোয়াড়েরা পার্শ্ব রেখার কাছাকাছি আসতে পারবে কিন্তু কোর্টের বাইরে যেতে পারবে না।

৪. খেলোয়াড় বদল : ৬ জন খেলোয়াড় কোর্টে খেলবে এবং অতিরিক্ত ৬ জন খেলোয়াড় কোচসহ নির্দিষ্ট জায়গায় বসবে। এই অতিরিক্ত খেলোয়াড় কোচ কিংবা ক্যাপটেনের অনুরোধে কোর্টের খেলোয়াড়দের সাথে বদল করা যাবে।

৫. খেলা পরিচালনা : একজন রেফারি, একজন আম্পায়ার, একজন স্কোরার ও দু জন লাইন জাজ দ্বারা খেলা পরিচালনা করা হয়। কোর্টে খেলা শুরুর সময় থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । রেফারি নেটের যে কোনো এক প্রান্তে উঁচু জায়গায় অবস্থান করবেন যাতে নেটের কমপক্ষে ৫০ সেন্টিমিটার উপর থেকে কোর্টের সব জায়গায় খেলা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

৬. কোর্ট বদল : যদি চূড়ান্ত সেট না হয় তাহলে প্রতি সেট শেষ হওয়ার পর উভয় দল কোর্ট বদল করবে। চূড়ান্ত সেটে কোনো দল ৮ পয়েন্ট অর্জন করলে উভয় দল রেফারির সংকেত পেয়ে কোর্ট বদল করবে।

৭. খেলার ফলাফল : যে দল সার্ভিস করবে সেই দল যদি বলটির র‍্যালির সমাপ্তিতে জিততে পারে তবে একটি পয়েন্ট সংগৃহীত হবে। আর যদি ঐ র‍্যালিতে হেরে যায় তবে বিপক্ষ দল সার্ভিস ও পয়েন্ট পাবে। যে দল প্রথম ২৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করবে সে দল ঐ সেটে জয়ী হবে। তবে ঐ দলকে বিপক্ষ দল থেকে কমপক্ষে ২ পয়েন্ট বেশি থাকতে হবে। যদি উভয় দলের পয়েন্ট সমান হয় তাহলে এই ২ পয়েন্টের ব্যবধান না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকবে। ৫ সেটের প্রতিযোগিতায় যে দল ৩ সেটে জয়ী হবে সে দল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করবে। চূড়ান্ত সেট ১৫ পয়েন্টে সম্পন্ন হয়।

৮. সার্ভিস : পিছনের কোর্টের রোটেশন অনুযায়ী সর্বডানের খেলোয়াড় সার্ভিস করবে। সার্ভিস এরিয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে বল হাত থেকে শূন্যে ছেড়ে দিয়ে আঘাত করে বিপক্ষ কোর্টে প্রেরণ করতে হবে। তবে রেফারি সার্ভিসের জন্য সংকেত দেওয়ার পরই কেবল সার্ভিস করা যাবে। সার্ভিসের বল নেটের নিচ দিয়ে গেলে, নেট স্পর্শ করলে, নেটের অ্যান্টেনা ছুঁয়ে গেলে কিংবা বিপক্ষ কোর্টের বাইরে পড়লে সার্ভিসে ত্রুটি হবে এবং বিপক্ষ দল সার্ভিস করবে।

৯. বল খেলা : সার্ভিসের বা তার পরের কোনো বল কোর্টে আনার পর সে দল সর্বাধিক ৩ বার বলটি খেলতে পারবে এবং ৩ বার স্পর্শ করার পর বলটি বিপক্ষ কোর্টে প্রেরণ করতে হবে। বল অন্য সময় শরীরে স্পর্শ করলে একবার খেলা হয়েছে বলে ধরা হবে। খেলার সময় বল চেপে ধরে মারা, জোর করে বল উপরে তোলা, ঠেলে দেওয়া বা হাত দিয়ে টেনে আনাকে হোল্ডিং বলে ধরা হবে।

১০. ব্লক : বিপক্ষের স্ম্যাশ করা বা চাপ মারার বল কোর্টের সামনের সারির এক বা একাধিক খেলোয়াড় প্রতিহত করার জন্য লাফিয়ে উঠে হাত দিয়ে ব্লক করতে পারে। ব্লকের পর বল যে কোর্টে যাবে সে পক্ষ ৩ বার বলটি খেলতে পারবে। পিছনের সারির খেলোয়াড় ব্লকে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১১. নেটের বল : কেবল সার্ভিস বল ছাড়া অন্য সময় বল নেটে লাগতে পারে। নেটে লাগা বল ৩বার খেলা যাবে। তবে সজোরে নেটে লেগে বল কোনো খেলোয়াড়ের শরীর স্পর্শ করলে একবার খেলা হয়েছে বলে ধরা হয়। বিপক্ষ কোর্ট থেকে বল নেটের উপর নিজ কোর্টে না আসা পর্যন্ত নেটের উপর যে বল থাকে তা খেলা যাবে না। তবে স্পর্শ করার বা চাপ মারার পর গতির কারণে হাত নেটের উপর দিয়ে বিপক্ষ কোর্টে যেতে পারে। পিছনের সারির খেলোয়াড় নেটে গিয়ে চাপ মারতে পারবে না।

১২. সেন্টার লাইন পার হওয়া : খেলা চলাকালে কোনো খেলোয়াড়ের শরীরের কোনো অংশ বা পা সেন্টার লাইন পার হয়ে বিপক্ষ কোর্টে স্পর্শ করতে পারবে না বা কাউকে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

ভলিবল খেলার কলাকৌশল

ক. সার্ভিস : এক হাতে বল শূন্যে তুলে অপর হাত খোলা বা মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় জোরে আঘাত করে বিপক্ষের কোর্টে প্রেরণ করাকে সার্ভিস বলে। যদি সার্ভিস করা বল নেট বা অ্যান্টেনা স্পর্শ না করে, নেটের নিচ দিয়ে না যায় কিংবা বিপক্ষ কোর্টের বাইরে না পড়ে তাহলে সার্ভিস সঠিক বলে গণ্য হবে। সার্ভিস সাধারণত দুই প্রকার– ১. আন্ডার হ্যান্ড সার্ভিস, ২. টেনিস সার্ভিস।

১. আন্ডার হ্যান্ড সার্ভিস : বিপক্ষ কোর্টের দিকে মুখ করে সার্ভিস এরিয়াতে এক পা সামনে ও আরেক পা পিছনে রেখে দাঁড়াতে হবে। দুই পায়ের মাঝে কিছুটা ফাঁক থাকবে। দুই হাঁটু সামান্য ভেঙে পিছনের পায়ে দেহের ওজন রেখে দাঁড়াতে হবে। বাম হাতের তালুতে বল রেখে ডান হাতকে সোজা পিছনের দিকে নিতে হবে। বাম হাতের বল শূন্যে তোলার পর ডান হাত পিছন দিক থেকে সামনে এনে সজোরে বলে আঘাত করতে হবে। বিপক্ষ কোর্টের দিকে মুখ না করে কোর্টের পার্শ্বরেখার দিকে মুখ করে হাতের এক পাশ দিয়ে আঘাত করেও সার্ভিস করা যেতে পারে।

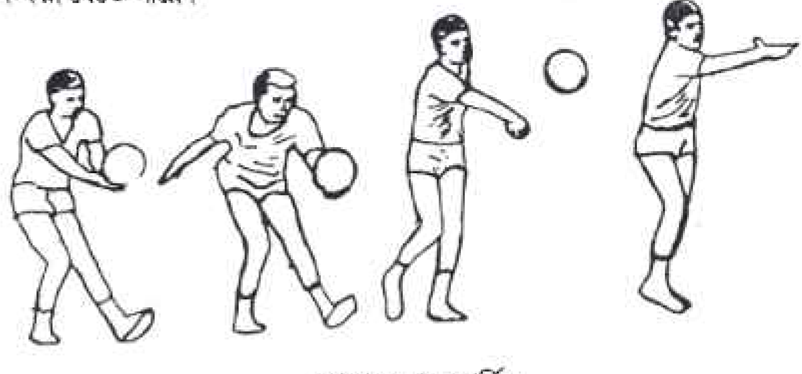

আন্ডার হ্যান্ড সার্ভিস

২. টেনিস সার্ভিস : সার্ভিস এরিয়ায় পা দুটোকে আড়াআড়ি করে দু পায়ের উপর শরীরের ওজন রেখে দাঁড়াতে হবে। ডান হাতে সার্ভিস করা হলে বাম পা কে সামনে নিতে হবে। হাঁটু দুটি সামান্য ভেঙে বাম হাতের তালুতে রাখা বল মাথার উপর প্রায় ১ মিটার উঁচুতে ছুড়ে দিতে হবে এবং বলটি নিচে নামার সাথে সাথে ডান হাত পিছন দিক থেকে কাঁধের উপরে এনে সজোরে আঘাত করতে হবে। সার্ভিসের পর পরই ভারসাম্য রক্ষার জন্য শরীরের ওজন পিছনের পা থেকে সামনের পায়ে নিয়ে আসতে হবে।

টেনিস সার্ভিস

খ. রোটেশনে দাঁড়ানো : ৬ জন খেলোয়াড়ের ক্রমিক নম্বর যদি ১ থেকে ৬ নম্বর হয় তাহলে সামনের কোর্টে ৩ জন এবং পিছনের কোর্টে ৩ জন দাঁড়াবে। সামনের কোর্টের ৩ জনের অবস্থান হবে–ডান দিকের ২ নম্বর, মধ্যখানে ৩ নম্বর এবং বাম দিকে ৪ নম্বর এবং পিছনের কোর্টে ৫ নম্বর সর্ব বামে, মধ্যখানে ৬ নম্বর এবং সর্ব ডানে ১ নম্বর খেলোয়াড় দাঁড়াবে। বিপক্ষ দলে সার্ভিস হারালে এই দল সার্ভিস করবে। তখন রোটেশন করতে হবে নিয়মানুযায়ী ১ নম্বর খেলোয়াড় পিছনের কোর্টের ৬ নম্বর খেলোয়াড়ের জায়গায় গিয়ে সার্ভিস করবে। এভাবে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের অবস্থান পরিবর্তিত হবে। রোটশন হবে clockwise অনুযায়ী, সাজানো হবে anticlock অনুযায়ী।

৪	৩	২
৫	৬	১

রোটেশন

গ. পাসিং : বল পাসকে সাধারণত দু ভাগে ভাগ করা যায়–(১) ওভার হেড পাস ও (২) আন্ডার হ্যান্ড পাস।

ঘ. সেট–আপ (Set-up) : কোর্টের সম্মুখ সারির কোনো খেলোয়াড় আন্ডার হ্যান্ড পাস বা ডিগিং থেকে প্রাপ্ত বল দুই হাতের প্রসারিত তালু ও আঙুল সহযোগে নেটের কাছাকাছি উপরে উঠিয়ে দেবে এবং স্ম্যাশকারী দৌড়ে এসে অথবা স্বীয় জায়গায় লাফ দিয়ে উঁচুতে উঠে বল স্ম্যাশ করবে। সেট–আপ যত সুন্দর হবে স্ম্যাশও তত নিখুঁত হবে।

বল পাসিং

ঙ. স্ম্যাশিং (Smashing) : স্ম্যাশিং-এর বলটিকে অবশ্যই নেটের উপরে থাকতে হবে। বলকে যেখানে স্ম্যাশ করতে হবে সেখান থেকে ৩–৪ পা পিছনে খেলোয়াড়দের অবস্থান থাকবে। সেখান থেকে দৌড়ে এসে লাফিয়ে উঠে শরীরকে বলের পিছনে নিয়ে আসতে হবে। এজন্য দু হাঁটু ভাঁজ করে লাফ দিতে হবে যাতে উঁচুতে উঠা যায়। যে হাতে স্ম্যাশ করতে হবে সেটা পিছন দিক থেকে ঘুরিয়ে বলের উপর নিতে হবে। স্ম্যাশ করার পর শরীর সোজা নিচে নেমে আসবে। অনেক সময় বিপক্ষ দলকে ভুল বুঝানোর জন্য বল স্ম্যাশ না করে হাতের সাহায্যে বিভিন্ন দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

স্ম্যাশিং

চ. ব্লকিং (Blocking) : বিপক্ষ দলের স্ম্যাশকে প্রতিরক্ষা করার জন্য কোর্টের সামনের সারির এক বা একাধিক খেলোয়াড় পরস্পরের হাত পাশাপাশি রেখে লাফিয়ে উঠে স্ম্যাশ প্রতিরোধ করতে পারে। ব্লক দেওয়ার সময়ে জোড়া পায়ে উপরে লাফিয়ে উঠতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন ব্লকিং করার সময়ে হাত নেট স্পর্শ না করে।

কাজ–১ : ভলিবল খেলার রোটেশন পদ্ধতির ছক অঙ্কন করে দেখাও।

কাজ–২ : টেনিস সার্ভিসের কলাকৌশলগুলো প্রদর্শন করো।

কাজ–৩ : ব্লকিং করার পদ্ধতিটি করে দেখাও।

ব্লকিং

পাঠ–৫: কাবাডি : পাক-ভারত উপমহাদেশের এটি একটি জনপ্রিয় প্রাচীন খেলা। এই উপমহাদেশে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন নামে খেলাটি অনুষ্ঠিত হতো। যেহেতু আঞ্চলিক খেলা তাই বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ছিল না। গ্রামাঞ্চলে এই হা-ডু-ডু খেলাই ছিল বিনোদনের একমাত্র উৎস। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হা-ডু-ডু খেলার পোশাকি নাম কাবাডি। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের খেলাধুলায় গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন পুনর্গঠন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের প্রচেষ্টায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২য় সাফ গেমসে কাবাডি অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকেই কাবাডি খেলা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখে। ১৯৯০ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে কাবাডি খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিয়মিত ইভেন্ট হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

কাবাডি মাঠ : মাঠ হবে সমান্তরাল এবং নরম। মাটি অথবা ম্যাট দ্বারা তৈরি হবে। কাবাডি খেলায় তিন ধরনের মাঠ রয়েছে–

১. পুরুষ ও জুনিয়র বালক।

২. মহিলা ও জুনিয়র বালিকা।

৩. সাব-জুনিয়র বালক ও বালিকা।

১. পুরুষ বলতে যাদের ওজন ৮০ কেজি বা তার নিচে তাদেরকে বোঝায়। জুনিয়র বালক বলতে যাদের ওজন ৬৫ কেজি বা তার নিচে এবং বয়স সর্বোচ্চ ২০ বছর। এদের মাঠের মাপ দৈর্ঘ্য– ১৩ মি., ১০ মিটার (লবিসহ)।

২. মহিলা বলতে যাদের ওজন ৭০ কেজি বা তার নিচে তাদেরকে বোঝায়। জুনিয়র বালিকা বলতে যাদের ওজন ৬০ কেজি বা তার নিচে। এদের বয়স সর্বোচ্চ ২০ বছর। মাঠের দৈর্ঘ্য হবে ১২ মি. ও প্রস্থ ৮ মি. (লবিসহ)।

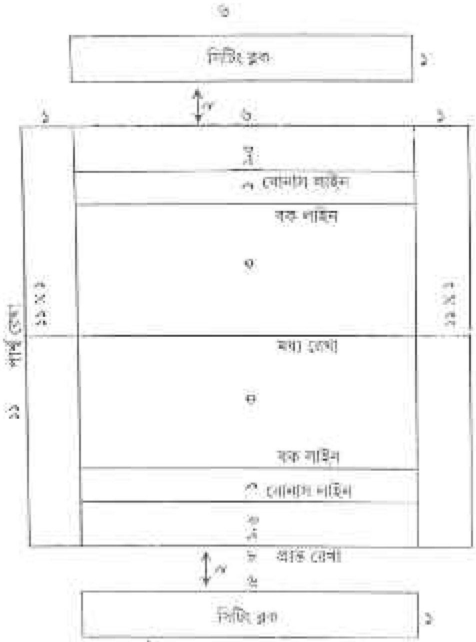

কাবাডি মাঠ (সাব-জুনিয়র বালক ও বালিকা)

৩. সাব-জুনিয়র বালক-বালিকা উভয়ের বয়স সর্বোচ্চ ১৬ বছর এবং ওজন ৫০ কেজি বা তার নিচে। এদের জন্য মাঠের মাপ হবে– দৈর্ঘ্য ১১ মি. × প্রস্থ ৮ মি. (লবিসহ)।

খেলার মাঠ : স্ট্রাগলের পূর্বে পুরুষ ও জুনিয়র বালকদের উভয় দিকের লবি বাদে দৈর্ঘ্য ১৩ মি. × প্রস্থ ৮ মি. মহিলা ও জুনিয়র বালিকাদের দৈর্ঘ্য ১২ মি. × প্রস্থ ৬ মি. এবং সাব-জুনিয়র বালক-বালিকাদের দৈর্ঘ্য ১১ মিটার × প্রস্থ ৬ মিটার।

সিটিং ব্লক : মরা খেলোয়াড়দের বসার জন্য যে জায়গা সংরক্ষিত রাখা হয় তাকে সিটিং ব্লক বলে। কাবাডি কোর্টের প্রান্তরেখা থেকে ২ মি: দূরে পুরুষদের জন্য ১ × ৮ মিটার ও মহিলা ও জুনিয়র বালিকাদের জন্য ১ × ৬ মিটার দু'টি ঘর থাকবে। তাকে সিটিং ব্লক বলে।

লবি : খেলার মাঠের উভয় দিকে ১ মি. চওড়া যে জায়গা আছে তাকে লবি বলে। স্ট্রাগল হলে লবি খেলার মধ্যে চলে আসে।

মধ্য রেখা : যে রেখা কোর্টকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেছে তাকে মধ্যরেখা বলে।

কোর্ট : প্রত্যেক অর্ধের খেলার মাঠ যা মধ্যরেখা দ্বারা বিভক্ত তাকে কোর্ট বলে।

বক লাইন : মধ্যরেখার সমান্তরালে কোর্টের দিকে যে দাগ দেওয়া হয় তাকে বক লাইন বলে। যার দূরত্ব পুরুষ ও জুনিয়র বালকদের ৩.৭৫ মিটার, মহিলা এবং জুনিয়র বালিকাদের ৩ মিটার এবং সাব-জুনিয়র বালক-বালিকাদের ৩ মিটার।

বোনাস লাইন : এন্ড লাইনের সমান্তরালে বক লাইনের দিকে ১ মিটার দূরে যে রেখা টানা হয় তাকে বোনাস লাইন বলে।

দম : এক নিঃশ্বাসে এক নাগাড়ে অনবরত সুস্পষ্টভাবে কাবাডি কাবাডি উচ্চারণ করাকে দম বলে।

রেইডার : দম নিয়ে যে খেলোয়াড় বিপক্ষ কোর্টে হানা দেয় তাকে রেইডার বলে। বিপক্ষের কোর্ট স্পর্শ করার পূর্বেই দম ধরতে হয়।

এন্টি রেইডার : যে কোর্টে দম চলছে সেই কোর্টের সমস্ত খেলোয়াড়কে এন্টি রেইডার বলে।

দম হারানো : রেইডার যদি স্পষ্টভাবে এবং অনবরত কাবাডি না বলে বা দম ছেড়েছে বোঝা যায় তাহলে দম হারানো হয়েছে বলে ধরা হবে।

এন্টিকে মারা : রেইডার যদি কোনো নিয়ম ভঙ্গ না করে এন্টির শরীরের যেকোনো অংশ স্পর্শ করে অথবা এন্টি রেইডারের শরীরের যেকোনো অংশ ধরা সত্ত্বেও দমসহ নিজ কোর্টে ফিরে আসে তাহলে এন্টি মারা হয়েছে বলে ধরা হবে।

রেইডারকে ধরা : কোনো নিয়ম ভঙ্গ না করে কোনো রেইডার যদি দম থাকা পর্যন্ত বা আম্পায়ারের বাঁশি না দেওয়া পর্যন্ত ধরে রাখে তাহলে রেইডারকে ধরা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্পর্শ : রেইডার যদি এন্টির শরীর বা শরীরের পরিধেয় পোশাক স্পর্শ করে তাহলে টাচ বা স্পর্শ হয়েছে বলে ধরা হবে।

স্ট্রাগল : যখন কোনো এন্টি বা এন্টিস রেইডারের সংস্পর্শে আসে তখন তাকে স্ট্রাগল বলে। স্ট্রাগল হলে লবি খেলার মধ্যে চলে আসে।

খেলার নিয়মাবলি

১। টসে যে দলের ক্যাপ্টেন জয়লাভ করবে সে তার পছন্দমতো রেইড/কোর্ট নেবে। পরাজিত দলের ক্যাপ্টেন অবশিষ্ট পছন্দ গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ার্ধে কোর্ট বদল হবে। খেলার শুরুর সময় যে দল দম দিয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে অপর দল দম দিয়ে খেলা শুরু করবে।

২। খেলোয়াড়ের শরীরের যেকোনো অংশ বাউন্ডারির বাইরের ভূমি স্পর্শ করলে সে মরা হবে। স্ট্রাগল হলে বাইরের ভূমি স্পর্শ করলে ঐ খেলোয়াড় মরা হবে না যদি তার শরীরের কোনো অংশ বাউন্ডারির ভিতরের ভূমির সাথে সংস্পর্শ থাকে।

৩। (ক) খেলার সময় যদি কোনো খেলোয়াড় বাউন্ডারির বাইরে যায় তাহলে সে আউট হবে। রেফারি/আম্পায়ার তার নম্বর কল করে তৎক্ষণাৎ ঐ খেলোয়াড়কে কোর্টের বাইরে নিয়ে যাবে। এ সময় বাঁশি বাজানো চলবে না, রেইড চলতে থাকবে।

(খ) রেইড চলাকালে কোনো এন্টি বা এন্টিস বাউন্ডারি সীমার বাইরে গিয়ে বা বাইরের ভূমি স্পর্শ করে রেইডারকে ধরে তাহলে রেইডার আউট হবে না, ঐ এন্টি আউট হবে।

৪। স্ট্রাগল শুরু হলে লবি খেলার মাঠ হিসেবে গণ্য হবে। স্ট্রাগলের সময় বা স্ট্রাগলের পরে যে সমস্ত খেলোয়াড় স্ট্রাগলে জড়িত ছিল তারা লবি ব্যবহার করে নিজ কোর্টে ফিরতে পারবেন।

৫। রেইডার অনুমোদিত শব্দ কাবাডি উচ্চারণ করে দম নেবে। যদি রেইডার ঠিকমতো কাবাডি উচ্চারণ না করে তাহলে রেফারি/আম্পায়ার কলব্যাক করবে এবং বিপক্ষদল একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট পাবে।

৬। রেইডার বিপক্ষের কোর্ট স্পর্শ করার পূর্বেই দম ধরতে হবে। যদি সে দম দেরিতে বা কোর্ট স্পর্শ করে ধরে তাহলে রেফারি/আম্পায়ার তাকে ব্যাক করাবে এবং বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট ও দম দেওয়ার সুযোগ দেবে।

৭। দম দেওয়ার সুযোগ (Turn) না থাকা সত্ত্বেও যদি রেইডার দম দেওয়ার জন্য বিপক্ষের কোর্টে প্রবেশ করে তাহলে তাকে রেফারি/আম্পায়ার ব্যাক করাবে ও বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট দেবে।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

১। **দল :** প্রত্যেক দল কমপক্ষে ১০ জন, সর্বাধিক ১২ জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হবে। ৭ জন খেলোয়াড় মাঠে একসাথে খেলবে বাকি খেলোয়াড় বদলি হিসেবে থাকবে।

২। **খেলার সময় :** পুরুষ এবং জুনিয়র বালকদের জন্য খেলার সময় হবে প্রত্যেক অর্ধে ২০ মিনিট করে, মাঝে বিরতি ৫ মিনিট। মহিলা বা জুনিয়র বালিকা ও সাব-জুনিয়র বালক ও বালিকা তাদের খেলার সময় হবে প্রতি অর্ধে ১৫ মিনিট করে। মাঝে বিরতি ৫ মিনিট। বিরতির পর কোর্ট বদল হবে। প্রথম অর্ধে যে কয়জন খেলোয়াড় মাঠে ছিল দ্বিতীয়ার্ধে ঐ কয়েকজন খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নামতে হবে।

৩। **পয়েন্ট গণনার পদ্ধতি :** এক পক্ষের প্রত্যেক খেলোয়াড় মরার জন্য বিপক্ষদল এক পয়েন্ট করে পাবে। এক পক্ষের সমস্ত খেলোয়াড় মরা হলে বিপক্ষ দল লোনার জন্য অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট পাবে।

৪। **টাইম আউট :** ক) একেক দল প্রত্যেক অর্ধে দুইবার টাইম আউট নিতে পারবে। যার স্থিতিকাল হবে ৩০ সেকেন্ড। দলনেতা, প্রশিক্ষক বা দলের একজন খেলোয়াড়ও টাইম আউট রেফারির অনুমতি সাপেক্ষে নিতে পারবে। টাইম আউটের সময় খেলার সময়ের সাথে যোগ হবে।

খ) টাইম আউটের সময় খেলোয়াড়গণ কোর্টের বাইরে যেতে পারবে না বা কোর্ট ত্যাগ করতে পারবে না। যদি এ নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে বিপক্ষ দল একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট পাবে।

গ) অফিসিয়াল টাইম আউট খেলোয়াড় আহত হলে, মাঠে পুনরায় দাগ দেওয়ার জন্য বা বহিরাগত দ্বারা খেলা ব্যাহত হলে অথবা এই জাতীয় কোনো ঘটনার জন্য কেবল রেফারি/আম্পায়ার টাইম আউট দেবেন। এই টাইম আউটের সময়ও মূল সময়ের সাথে যোগ হবে।

৫। বদলি

ক) অতিরিক্ত ৫ জন খেলোয়াড়ই রেফারির অনুমতি নিয়ে টাইম আউট অথবা বিরতির সময় বদল করা যাবে।

খ) বদলিকৃত খেলোয়াড় পুনরায় মাঠে নামতে পারবে।

কাবাডি খেলার কলাকৌশল

কাবাডি খেলায় দুই ধরনের কৌশল আছে–

(১) রক্ষণাত্মক কৌশল (২) আক্রমণাত্মক কৌশল

১. **রক্ষণাত্মক কৌশল :** এন্টি রেইডার বা যে কোর্টে দম চলছে ঐ কোর্টের সমস্ত খেলোয়াড় যে কৌশল অবলম্বন করে তাকে রক্ষণাত্মক কৌশল বলে। যেমন–

(ক) গোড়ালি ধরা (খ) হাঁটু ধরা (গ) কোমর ধরা (ঘ) হাতের কব্জি ধরা (ঙ) চেইন দিয়ে ধরা ইত্যাদি।

গোড়ালি ধরা

ক. গোড়ালি ধরা : যখন রেইডার পা দ্বারা বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন এই কৌশল ব্যবহার করা হয়। বাম দিকের খেলোয়াড় এই কৌশল ব্যবহারের সময় বাম পা সামনে রেখে ডান হাত পায়ের নিচে এবং ডান হাত পাতার উপরে ধরতে হবে। পা সামনে রাখা ও হাতের ধরা একই সাথে হতে হবে। গোড়ালি ধরার সাথে সাথে পা উঁচু করে বুকের দিকে টেনে আনতে হবে।

খ. হাঁটু ধরা : যখন রেইডার পা দ্বারা ছোঁয়ার চেষ্টা করে বা পায়ের নড়াচড়ার সময় পা স্থির থাকে বা দুই পা একত্র হয় তখন এই কৌশল ব্যবহার করা হয়। বাম দিকের খেলোয়াড় ধরলে বাম পা, এবং ডান দিকের খেলোয়াড় ধরলে ডান পা সামনে যাবে বাম হাত নিচু দিয়ে ও ডান হাত উপর দিয়ে ধরে কাঁধ দিয়ে চেপে ধরতে হবে।

গ. কোমর ধরা : রেইডার দম দেওয়ার সময় বিপক্ষের দিকে পিঠ দেয় ঐ সময় এই কৌশল প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ পিঠ দেওয়ার সাথে সাথে তড়িৎ গতিতে কোমর ধরে উঁচু করে ফেলতে হবে।

ঘ. হাতের কব্জি ধরা : রেইডার হাত দ্বারা ছোঁয়ার সময় অথবা হাত যদি স্থির অবস্থায় থাকে তখন কব্জি ধরা হয়।

ঙ. চেইন দিয়ে ধরা : চেইন দিয়ে ধরা খুবই কার্যকর। বেশির ভাগ প্রশিক্ষক চেইন দিয়ে ধরার উপর বেশি জোর দিয়ে থাকে। রেইডার দম দেওয়ার সময় তার শরীর যখন বিপক্ষ খেলোয়াড়ের দিকে ঝুঁকে যায় তখনই এই কৌশল প্রয়োগ করতে হয়।

চেইন দিয়ে ধরা

২. আক্রমণাত্মক কৌশল : রেইডার দম দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে তাকে আক্রমণাত্মক কৌশল বলে। যেমন—পা দিয়ে ছোঁয়া, হাত দিয়ে ছোঁয়া, ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়া।

ক. পা দিয়ে ছোঁয়া : যখন রেইডার দম দিয়ে পা দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে পা দিয়ে ছোঁয়া বলে। পা দিয়ে ছোঁয়া বিভিন্ন কায়দায় করা যায়।

খ. হাত দিয়ে ছোঁয়া : রেইডার দম দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে যখন হাত দ্বারা ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া বলে। হাত দ্বারা বিভিন্নভাবে ছোঁয়া যায়– উপর থেকে নিচে, নিচ থেকে উপরে, সামনে থেকে পাশে, পাশ থেকে সামনে ইত্যাদি। সাধারণত যে হাত দিয়ে মারার চেষ্টা করা হয় সেই পা আগে যায়। হাত দিয়ে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের নাক, কান, মাথা, কাঁধ, শরীর বা উপরের যে কোনো অংশে স্পর্শ করার চেষ্টা করা হয়।

গ. ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়া : যখন রেইডার শরীর দ্বারা ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়া বলে। এই কৌশল খুবই ফলপ্রসূ। বেশির ভাগ রেইডার এই কৌশল প্রয়োগ করে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। ধোঁকা দেওয়ার সময় রেইডার এক দিকে যাওয়ার পূর্ব ভঙ্গিমা দেখায় কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে গতি বা আক্রমণ পরিবর্তন করে অন্য দিকে ধাওয়া করে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। যে রেইডার ধোঁকা দিতে বেশি দক্ষ সে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের মারতেও পারে অনেক বেশি।

খেলার অফিসিয়ালস : কাবাডি খেলা পরিচালনার জন্য মোট ৬ জন অফিসিয়াল প্রয়োজন হয়।

১. একজন রেফারি, ২. দুইজন আম্পায়ার, ৩. একজন স্কোরার, ৪. দুইজন সহকারী স্কোরার

রেফারি : রেফারিই মাঠে সর্বেসর্বা। তিনি খেলা আরম্ভ ও খেলা শেষ করবেন। দুই আম্পায়ারের মধ্যে সিদ্ধান্তের মতভেদ হলে খেলার স্বার্থে তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন।

আম্পায়ার : খেলার আইন অনুসারে খেলা পরিচালনা করবেন।

স্কোরার : আম্পায়ার কর্তৃক ঘোষিত পয়েন্ট স্কোর শিটে তুলে রাখবেন।

সহকারী স্কোরার : সহকারী স্কোরার মরা খেলোয়াড় ঠিকমতো বসাবেন ও নিয়মমতো মাঠে প্রবেশ করাবেন।

মারাত্মকভাবে নিয়ম লঙ্ঘন ও অপরাধ : নিম্নলিখিত অপরাধগুলো করলে রেফারি বা আম্পায়ার উক্ত খেলোয়াড়কে সতর্ক, বিপক্ষ দলকে পয়েন্ট, সাময়িক বহিষ্কার অথবা অযোগ্য করার ক্ষমতা রাখে।

১. সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অফিসিয়ালকে প্ররোচিত করা।

২. সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করা।

৩. সিদ্ধান্ত আদায়ের জন্য অঙ্গুলি প্রদর্শন করা।

৪. রেইডারের দম আটকানোর জন্য গলা বা মুখ চেপে ধরা।

৫. এমনভাবে খেলা হবে যা বিপক্ষ খেলোয়াড়ের আহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৬. দম দিতে ৫ সেকেন্ডের বেশি সময় নেওয়া।

৭. পা দ্বারা কাঁচি মারা বা কাঁচির সাহায্যে ধরা।

৮. প্রশিক্ষক বা খেলোয়াড় মাঠের বাইরে থেকে কোচিং দেওয়া।

৯. রেইডারকে দম প্রদানে বাধা দেওয়া।

বোনাস পয়েন্ট : বোনাস লাইন অতিক্রম করলে রেইডার পক্ষ একটি বোনাস পয়েন্ট পাবে। তবে কোর্টে কমপক্ষে ৬ জন খেলোয়াড় থাকতে হবে।

পাঠ–৬: বাস্কেটবল : বাস্কেটবল খেলা প্রথম শুরু হয় আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে ১৮৮১ সালে। এ খেলার জনক হলেন আমেরিকার স্প্রিংফিল্ড ওয়াই.এম.সি.এ কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ডা. জেমস নেইস্মিথ। প্রথমে একদলে ১০/১৫ জন করে খেলায় অংশ নিত। ১৮৯৪ সাল থেকে ৫ জন করে একদলে খেলার নিয়ম চালু হয়। বাংলাদেশে প্রথমে খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুলগুলোতে যেমন–ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট জোসেফ ও চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিড এবং অন্যান্য মিশনারি স্কুলগুলোতে বাস্কেটবল খেলা শুরু হয়। এ খেলাতে প্রচুর দমের প্রয়োজন হয়।

বাস্কেটবল খেলার নিয়মাবলি

১. **কোর্ট** : বাস্কেটবল খেলার কোর্ট হবে আয়তাকার ক্ষেত্র, মেঝে হবে শক্ত ও সমতুল্য এবং বাধাহীন। জাতীয় ও আঞ্চলিক খেলার কোর্টের দৈর্ঘ্য হবে ২৬ মিটার এবং প্রস্থ ১৪ মিটার। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য কোর্টের দৈর্ঘ্য ২৮ মিটার হবে ও প্রস্থ ১৫ মিটার হবে।

২. কোর্টের বৃত্ত : কোর্টের মাঝে ৩টি বৃত্ত আছে। প্রত্যেকটির ব্যাসার্ধ ১.৮০ মিটার।

৩. সংরক্ষিত এলাকা : এন্ড লাইনের মধ্যবিন্দু থেকে উভয় দিকে ১.৮০ মিটার করে নিয়ে দুটি চিহ্ন দিতে হবে। এন্ড লাইনের মাঝ থেকে সামনের দিকে বৃত্তের মাঝের দাগের দুই মাথা বরাবর দাগ টানতে হবে। এই দাগের ভিতরের জায়গাকে সংরক্ষিত এলাকা বলে।

৪. রিং : কোর্ট থেকে রিং-এর উচ্চতা ৩.০৫ মি.। বোর্ড থেকে ১৫ সে.মি. দূরে রিং লাগানো হয়। রিং-এর সাথে নেট লাগানো থাকবে।

৫. বল : বলের আকৃতি হবে গোলাকার। বলের উপরে ৮টি প্যানেল থাকবে। বলের রং হবে কমলা। উপরিভাগ হবে খসখসে।

৬. খেলার সময় : মোট সময় ৪০ মিনিট। চারভাগে খেলা হয়। প্রতিভাগে ১০ মিনিট করে। ১ম ও ২য় পর্বের এবং ৩য় ও ৪র্থ পর্বের মাঝে বিরতি ২ মিনিট। খেলার মাঝে বিরতি ১৫ মিনিট।

৭. পয়েন্ট : ৬.২৫ মিটার দাগের বাইরে থেকে স্কোর হলে ৩ পয়েন্ট। ৬.২৫ মিটার দাগের ভিতর থেকে স্কোর হলে ২ পয়েন্ট। ফ্রি থ্রো থেকে স্কোর হলে ১ পয়েন্ট।

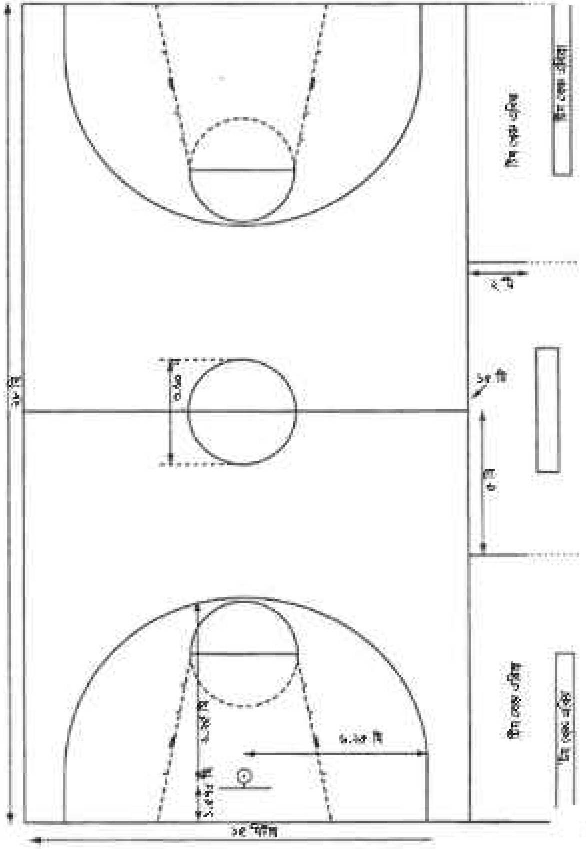

বাস্কেটবল কোর্ট

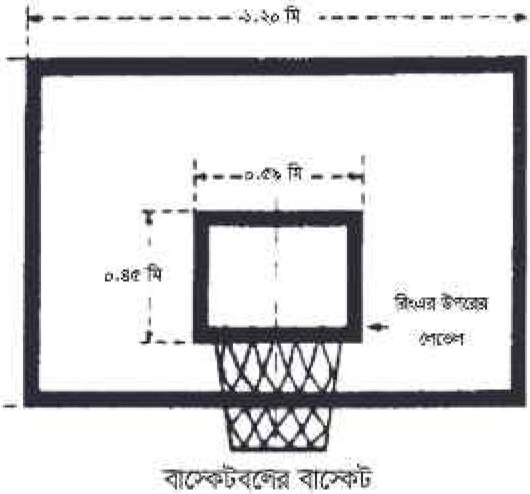

বাস্কেটবলের বাস্কেট

৮. খেলা শুরু : টসের মাধ্যমে কোনো দল কোন বাস্কেটে গোল করবে তা নির্ধারণ করতে হবে। পরে কোর্টের মাঝের বৃত্তের দুই দলের দুই জন খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে থাকবে। রেফারি মাঝে দাঁড়িয়ে বল শূন্যে ছুড়ে দিয়ে খেলা শুরু করবেন।

৯. ৩ সেকেন্ড রুল : যে দলের খেলোয়াড় বল নিয়ন্ত্রণ করছে সেই দলের কোনো খেলোয়াড় সংরক্ষিত এলাকায় বল ছাড়া ৩ সেকেন্ডের বেশি সময় থাকতে পারে না। এমনকি দাগও স্পর্শ করতে পারে না।

১০. ৫ সেকেন্ড রুল

ক. রেফারির সংকেতের পর ৫ সেকেন্ডের ভিতর বল থ্রো করতে হবে।

খ. ৫ সেকেন্ডের বেশি সময় কেউ বল ধরে রাখতে পারবে না।

গ. বল ধরার পর ৫ সেকেন্ডের ভিতর বল ড্রিবল বা পাস করতে হবে।

১১. ৮ সেকেন্ড রুল : নিজেদের কোর্টে বল ৮ সেকেন্ড পর্যন্ত আয়ত্তে রাখা যায়। ৮ সেকেন্ডের ভিতর বিপক্ষের কোর্টে বল নিয়ে যেতে হবে।

১২. ২৪ সেকেন্ডে রুল : একটি দলের সমস্ত খেলোয়াড় মিলে ২৪ সেকেন্ড পর্যন্ত বল আয়ত্তে রাখতে পারবে।

১৩. ভায়োলেশন : খেলার নিয়ম ভঙ্গ করা যেমন ব্যক্তিগত ফাউলের সময় হাত না তোলা, ৩, ৫, ৮ সেকেন্ডে রুল ভঙ্গ করা ইত্যাদি।

১৪. টেকনিক্যাল ফাউল : অফিসিয়ালদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার নিয়মভঙ্গ করে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ করলে।

১৫. ব্যক্তিগত ফাউল : বল খেলার সময় বা ডেড অবস্থায় বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সাথে অবৈধ কায়িক সংঘর্ষ হলে তাকে ব্যক্তিগত ফাউল বলে।

১৬. ইচ্ছাকৃত ফাউল : কোনো খেলোয়াড় ইচ্ছাকৃতভাবে বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড়কে ফাউল করলে ইচ্ছাকৃত ফাউল হয়।

১৭. ডাবল ফাউল : দুই দলের দুইজন খেলোয়াড় একই সাথে একে অপরের বিরুদ্ধে ফাউল করলে যে অপরাধ হয় তাকে ডাবল ফাউল বলে।

১৮. ফাইভ ফাউল : ৪০ মিনিটের খেলায় কোনো খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ও টেকনিক্যাল সর্বমোট ৫টি ফাউল করলে তাকে অবশ্যই কোর্ট ত্যাগ করতে হবে।

১৯. সেভেন ফাউল : দলীয়ভাবে কোনো দল প্রতি অর্ধে ৭টি ব্যক্তিগত বা টেকনিক্যাল ফাউল করলে এবং ৪ × ১০ মিনিটের খেলায় প্রতি পর্বে ৪টি ব্যক্তিগত ও টেকনিক্যাল ফাউল করলে পরবর্তী ফাউলের জন্য ২টি করে ফ্রি থ্রো দেওয়া হবে। যাকে ফাউল করা হয়েছে সেই ফি-থ্রো মারবেন।

কলাকৌশল : ভালো বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের জন্য দরকার দম, ক্ষিপ্রতা, গতি ও লাফ দেওয়ার ক্ষমতা। এর সাথে নিচের মৌলিক কলাকৌশলগুলোর দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

১. দাঁড়াবার ভঙ্গি : সুবিধামতো দুই পা ফাঁক করে দুই পায়ে সমান ভর করে দাঁড়াতে হবে। হাঁটু সামান্য ভেঙে শরীরের উপরের অংশ বাঁকিয়ে দুই হাত বুকের কাছাকাছি উঁচু করে ধরে রাখতে হবে। কনুই দুইটি নিচের দিকে থাকবে।

২. বল ধরা : বল এমনভাবে ধরতে হবে যেন বলটা নিজের আয়ত্তে থাকে। বল ধরার সময় আঙুলগুলো ছড়িয়ে বুড়ো আঙুলগুলোই বলকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। হাতের তালু দিয়ে বল ধরা ঠিক নয়।

৩. বল পাস দেওয়া : বল পাস দেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে যে, এ সময় কব্জি ও কনুই শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বল পাস দেওয়ার সময় এক পা সামনে ও অপর পা পিছনে থাকে। বাস্কেটবল পাস দেওয়া হয় সাধারণত–

ক. চেস্ট পাস : বুক বরাবর দ্রুত পাস দেওয়া।

খ. মাথার নিচ দিয়ে পাস : খুব কাছাকাছি ও দ্রুত পাস দেওয়ার জন্য এ পাসের প্রয়োজন হয়।

গ. হুক পাস: বিপক্ষ থেকে দূরে বা তাদের মাথার উপর দিয়ে এ পাস দিতে হয়। সাধারণত এক হাত দিয়ে এ পাস করতে হয়।

ঘ. বাউন্স পাস : বল ধরে সতীর্থ খেলোয়াড়ের কাছে কোর্টে ড্রপ দিয়ে পাস দেওয়া।

৪. ড্রিবলিং : জায়গা পরিবর্তন বা সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ড্রিবলিং করতে হয়। একহাত দিয়ে বা পর্যায়ক্রমে ডান বা বাম হাত দিয়ে বা বারবার কোর্টে ড্রপ দেওয়াকে ড্রিবলিং বলে। বলে চাপ দেওয়ার সময় হাতের আঙুলগুলো খোলা থাকবে এবং আঙুল দিয়ে বলকে চাপ দিতে হবে।

৫. পিভটিং : পায়ের উপর ঘোরাকে পিভটিং বলে। একটি পা একই জায়গায় রেখে অন্য পা-টিকে যেকোনো দিকে যতবার ইচ্ছে ঘুরিয়ে নেওয়াকে পিভটিং বলে।

৬. শ্যুটিং : বাস্কেটে বল ছোড়াকে শ্যুটিং বলে। বাস্কেটে সরাসরি শ্যুট করা যায় আবার বোর্ডে লাগিয়েও গোল করা যায়।

ক. সেট শ্যুট : এক জায়গায় বা দাঁড়ানো অবস্থায় যে শ্যুট করা হয় তাকে সেট শ্যুট বলে। এ শ্যুট এক হাত বা দুই হাত দিয়ে করা যায়। এক হাত দিয়ে শ্যুট করার সময় যে হাত দিয়ে শ্যুট করা হয় সে হাত বলের পিছনে থাকে। অন্য হাত বলের পাশে সাপোর্ট হিসেবে থাকে। দুই হাত দিয়ে শ্যুট করার সময় উভয় হাতই বলের পিছনে থাকবে।

খ. লেআপ-শট : কাছ থেকে গোল করার জন্য সাধারণত এ শট করা হয়। এ শট করার সময় খেলোয়াড় ড্রিবলিং করতে করতে এগিয়ে যায় এবং এক পা দিয়ে জোরে মেঝেতে আঘাত করে শরীর উঁচুতে তুলে নেয় এবং যে হাত দিয়ে বল মারবে সে হাত সম্পূর্ণ সোজা করে দিয়ে বল সরাসরি বাস্কেটে ঢোকায় বা বোর্ডে মেরে বাস্কেটে ঢোকায়।

কাজ–১ : বাস্কেটবল ধরার কায়দাগুলো প্রদর্শন করো।

কাজ–২ : সঙ্গীকে সাথে নিয়ে চেস্ট পাস করে দেখাও।

কাজ–৩ : লে-আপ শটের কৌশলগুলো অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ–৭: হকি : যতদূর জানা যায় খ্রিষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে পারস্য দেশে হকি খেলার মতো এক প্রকার খেলা প্রচলিত ছিল। পরে পারস্য থেকে গ্রিসে ও গ্রিস থেকে রোমে প্রচলিত হয়। ঐতিহাসিকরা আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রিসের এক খেলার সাথে আজকের এ খেলার সাদৃশ্য দেখতে পান। পরে ফ্রান্সের লোকেরা 'হকেট' (Hocket) নামে খেলা শুরু করেন। হকেট একটি ফরাসি

শব্দ যার অর্থ মেষপালকের লাঠি। এরও অনেক পরে ইংল্যান্ডের লোকেরা ফ্রান্সের কাছ থেকে এ খেলা শিখে 'হকে' (Hoque) নাম দিয়ে খেলতে শুরু করে। ইংরেজি উচ্চারণ অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে এ খেলা হকি নামে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

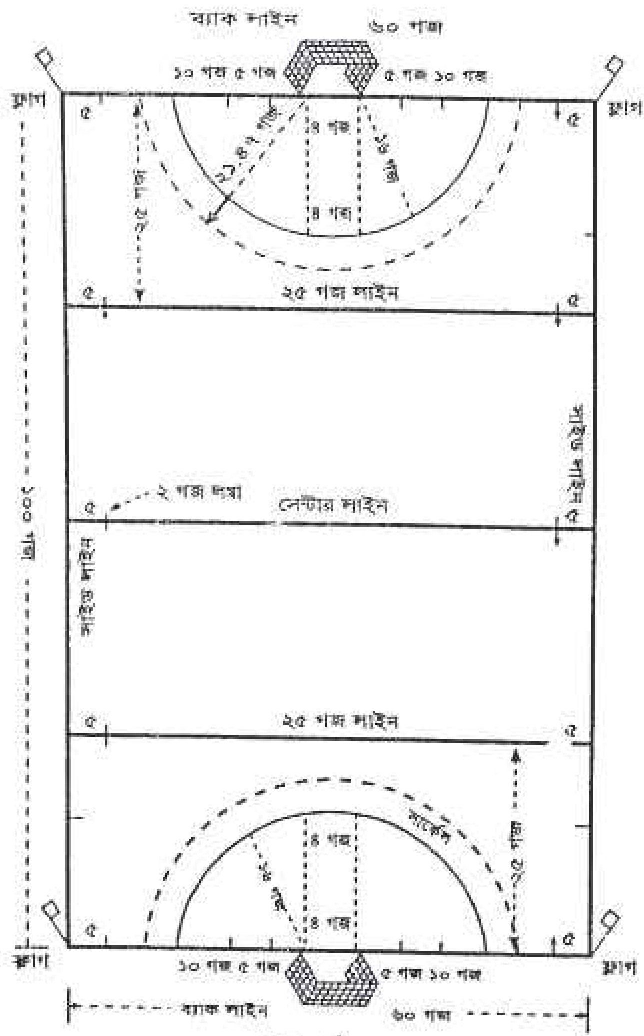

হকি মাঠ

হকি খেলার আইনকানুন

১. দল : ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। ১১ জন খেলা করে এবং বাকি ৫ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে থাকে।

২. আক্রমণকারী : খেলার সময় যে দলের খেলোয়াড়রা গোল করার জন্য চেষ্টারত থাকে তাদেরকে আক্রমণকারী বলে।

৩. রক্ষণদল : খেলার সময় যে দল গোলরক্ষা করার জন্য চেষ্টারত থাকে সে দলকে রক্ষণদল বলে।

৪. সেন্টার পাস : মাঠের কেন্দ্রে বল বসিয়ে যে কোনো দিকে বল পুশ বা হিট করাকে সেন্টার পাস বলে। অর্থাৎ এই পাসের মাধ্যমে খেলা শুরু হয়।

৫. বল খেলা : স্টিক দ্বারা বলকে থামিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া, দিক পরিবর্তন বা বলের গতি আনয়ন করাকে বোঝায়।

৬. প্লেইং ডিস্ট্যান্স : যে দূরত্বে থেকে একজন খেলোয়াড় বলের নিকট পৌঁছে খেলার চেষ্টা করতে পারবে।

৭. ট্যাকেল : বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে বল ছিনিয়ে নেওয়ার কৌশলকে ট্যাকল বলে।

৮. গোলে বল মারা : সার্কেলের ভিতর থেকে আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড় বলকে গোলপোস্টের ভিতরে মারার চেষ্টা করা বোঝায়।

৯. অপরাধ : এমন কাজ করা যার ফলে আইন ভঙ্গের জন্য আম্পায়ার শাস্তি প্রদান করেন।

১০. স্ট্রোক : স্টিকের সাহায্যে বলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আঘাত করা বা সরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে স্ট্রোক বলে।

২০২৫

১১. পেনাল্টি স্ট্রোক : পেনাল্টি স্পট থেকে পুশ, ফ্লিক বা স্কুপ করে গোল করার চেষ্টাকে পেনাল্টি স্ট্রোক বলে।

১২. ডেঞ্জারাস প্লে : ডেঞ্জারাস প্লে হচ্ছে এমন এক কৌশল যা খেলোয়াড়দের জন্য বিপজ্জনক।

১৩. মিস কন্ডাক্ট : সময় নষ্ট করা, ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করা, খেলার মধ্যে খারাপ আচরণ করা, অধিনায়কের কথা না শোনা ইত্যাদি মিস কন্ডাক্টের আওতায় পড়ে।

খেলার মাঠ : হকি খেলার মাঠ হবে আয়তাকার ক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য ১০০ গজ এবং প্রস্থ ৬০ গজ। দৈর্ঘ্যের রেখাকে পার্শ্বরেখা, প্রস্থের রেখাকে পিছনের রেখা এবং গোলের মধ্যের রেখাকে গোলরেখা বলে। দাগগুলো ৩ ইঞ্চি চওড়া হবে।

শ্যুটিং সার্কেল : খুঁটি থেকে উভয়দিকে ১৬ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে খুঁটি বরাবর দাগ টানতে হবে। পরে মাঝের ৪ গজ সোজা রেখা দ্বারা সংযুক্ত করতে হবে। একেই শ্যুটিং সার্কেল বলে। এই সার্কেলের ৫ মি. বাইরে দিয়ে আরেকটি অনুরূপ দাগ দিতে হবে। তবে দাগগুলো ডট ডট চিহ্নিত হবে। এ দাগ খেলোয়াড় দাঁড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

মধ্যরেখা ও ২৫ গজ রেখা : মাঠের দৈর্ঘ্যের ঠিক মাঝখানে প্রস্থ বরাবর একটি রেখা টানতে হবে তাকে মধ্যরেখা বলে। এই মধ্যরেখা ও পিছনের রেখার মাঝখানে আরেকটি রেখা টানতে হবে যাকে ২৫ গজ রেখা বলে।

গোলপোস্ট : দুই পোস্টের ভিতরের দূরত্ব হবে ৪ গজ, মাটি থেকে ক্রসবারের নিচ পর্যন্ত উচ্চতা হবে ৭ ফুট। গোলপোস্টের ও ক্রসবারের রং হবে সাদা।

বল : বল যেকোনো শক্ত পদার্থের তৈরি হবে। বলের রং হবে সাদা। তবে দুই দলের সম্মতিতে অন্য রঙের বল দিয়েও খেলা যায়।

হকি স্টিক : স্টিক সোজা ও মাথার অংশ বাঁকা থাকবে। স্টিকের বাম পার্শ্ব চ্যাপ্টা ও ডান পার্শ্ব মসৃণ ও গোলাকৃতি হবে। স্টিকের বাঁকা অংশ ৪″-এর বেশি হবে না। ২″ ব্যাসের একটি রিং স্টিকের ভিতর দিয়ে চলে এলে স্টিকটি বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

গোলকিপার : গোলকিপার অন্য খেলোয়াড়দের থেকে ভিন্ন রঙের পোশাক পরবে এবং শরীরের উপরের অংশ রক্ষার জন্য প্রটেক্টর ব্যবহার করবে। লেগ গার্ড, কিকার ও হ্যান্ড প্রটেক্টরও ব্যবহার করতে পারবে।

খেলার সময় : প্রতি অর্ধে খেলার সময় ৩৫ মিনিট, মাঝে বিরতি ৫ থেকে ১০ মিনিট অর্থাৎ ৩৫ + ৩৫ = ৭০ মিনিট, বিরতিসহ ৭৫ মিনিট।

পেনাল্টি কর্নার : রক্ষণদলের কোনো খেলোয়াড় ক. ইচ্ছাকৃতভাবে সার্কেলের ভিতর অপরাধ করলে খ. নিশ্চিত গোল বাঁচানোর জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে সার্কেলের ভিতর অপরাধ করলে গ. গোলকিপার বারবার নিয়মভঙ্গ করলে বিপক্ষ দলকে পেনাল্টি কর্নার দেওয়া হয়। গোললাইন থেকে মাঠের দিকে ৭ গজ স্থান থেকে পেনাল্টি কর্নার মারতে হয়।

কলাকৌশল

স্টিক ধরা : বাম হাত দিয়ে স্টিকের মাথা ধরতে হবে, ডান হাত স্টিকের মাঝামাঝিতে হালকাভাবে ধরতে হবে। ডান পা সামনে ও বাম পা পিছনে থাকবে। স্টিক ডানেবামে যে দিকে ঘোরানো হোক না কেন বাম হাতের কব্জি শুধু ঘোরাতে হবে। ডান হাত শুধু সাপোর্ট হিসেবে থাকবে।

বল থামানো : বলের লাইন বরাবর স্টিকের মাথা নিতে হবে। স্টিকের চ্যাপ্টা অংশ দিয়ে বল থামাতে হবে।

এক পা সামনে ও আরেক পা পিছনে থাকবে।

বল ড্রিবলিং : বল সামনে থাকবে। স্টিক ডানেবামে ঘুরিয়ে বলকে সামনের দিকে নিতে হবে। মাঝে মাঝে একটু দূরে ঠেলা দিয়েও ড্রিবলিং করা যায়। স্টিকের চ্যাপ্টা অংশ দিয়েই বল সামনে নিতে হবে। হাতের ভিতর স্টিক শুধু ঘুরবে।

হিট : দুই পা সমান্তরাল রেখে দাঁড়াতে হবে। বল ১ $\frac{১}{২}$ ফুট থেকে ২ ফুট সামনে থাকবে। স্টিক কাঁধ বরাবর তুলে বলের মাঝখানে জোরে আঘাত করতে হবে। এই জোরে আঘাত করাকেই হিট বলে।

পুশ : বলের সাথে স্টিক লাগিয়ে কোনো শব্দ না করে প্রয়োজনীয় গতি প্রয়োগের মাধ্যমে বলটি মাঠ থেকে গড়িয়ে দেওয়াকে পুশ বলে।

ফ্লিক : যখন একটি স্থির বা গড়ানো বল পুশ করা হয় এবং বলটি হাঁটু পর্যন্ত উপরে ওঠে তখন তাকে ফ্লিক বলে।

স্কুপ : একটি স্থির গতিহীন বলের খানিকটা নিচে স্টিক রেখে উপরের দিকে চালনার সাহায্যে বল শূন্য অর্থাৎ মাথার উপরে উঠানোকে স্কুপ বলে।

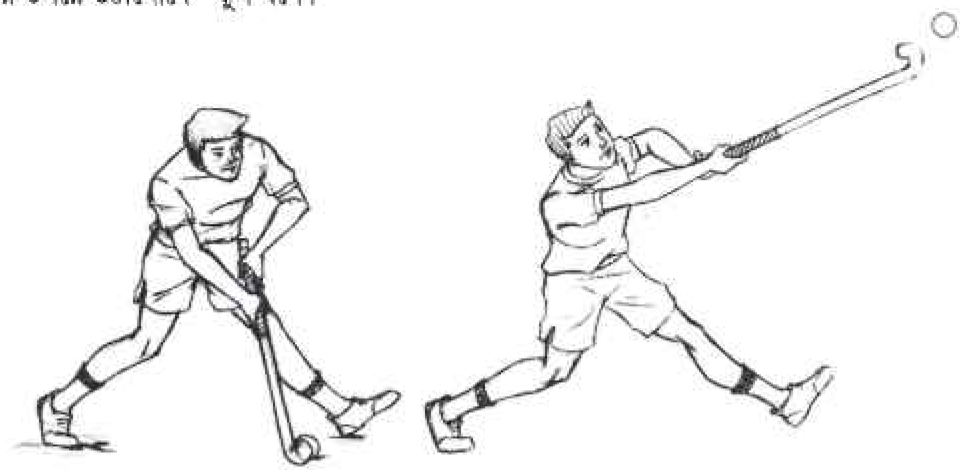

স্কুপ

কাজ–১ : হকি খেলায় পেনাল্টি স্ট্রোক মারার কৌশলগুলো মাঠে দেখাও।

কাজ–২ : স্কুপ-এর কৌশলগুলো উপস্থাপন করো এবং সতীর্থের কাছে স্কুপ করে দেখাও।

কাজ–৩ : হকি স্টিক ধরার নিয়মগুলো বলো।

পাঠ–৮: হ্যান্ডবল : হ্যান্ডবল খেলার উৎপত্তি হয়েছে জার্মানিতে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জার্মান গীতি কবিতায় ক্যাচবল (Catch ball) জাতীয় খেলার উল্লেখ আছে। ১৯১৭ সালে মহিলাদের ক্রীড়া শিক্ষক বার্লিনের ম্যাক্স হিসার মেয়েদের জন্য হ্যান্ডবল খেলার প্রচলন করেন। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে তা ফেডারেশনে উন্নীত হয়।

১. হ্যান্ডবল খেলার মাঠ : মাঠের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার, প্রস্থ ২০ মিটার। দাগগুলো ৫ সে.মি. চওড়া, গোলপোস্টের ভিতরের লাইন ৮ সে.মি. চওড়া। দৈর্ঘ্যের দাগকে পার্শ্বরেখা ও প্রস্থের দাগকে গোল লাইন বলে।

২. গোলপোস্ট : মাটির উপর থেকে ক্রসবারের নিচ পর্যন্ত উচ্চতা ২ মিটার, দৈর্ঘ্য ৩ মিটার।

৩. গোলসীমা : উভয় গোলপোস্ট হতে ৬ মিটার ব্যাসার্ধ দিয়ে দুই গোলপোস্ট বরাবর রেখা টানতে হবে। গোলপোস্টের সমান্তরাল তিন মিটার সোজা রেখা হবে।

৪. ফ্রি-থ্রো লাইন এরিয়া : উভয় গোলপোস্ট হতে ৯ মিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে দুই গোলপোস্ট বরাবর ডট, ডট রেখা এঁকে এরপর গোলপোস্টের সমান্তরাল ৩ মিটার সোজা ডট হবে।

৫. পেনাল্টি লাইন : গোলপোস্টের মাঝ থেকে ৭ মিটার দূরে গোল লাইনের সমান্তরালে ১৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য রেখাকে বোঝায়।

৬. চার মিটার লাইন : গোলপোস্টের মধ্যবিন্দু থেকে ৪ মিটার দূরে গোল লাইনের সমান্তরালে ১৫ সে:মি: দৈর্ঘ্য রেখাকে চার মিটার লাইন বোঝায়।

৭. খেলার স্থিতিকাল

১৬ বছর বা তার ঊর্ধ্বের ছেলেমেয়েদের জন্য ৩০ + ১০ (বিরতি) + ৩০ = ৭০ মিনিট।

১২–১৬ বছর ছেলেমেয়েদের জন্য ২৫ + ১০ (বিরতি) + ২৫ = ৬০ মিনিট।

৮. অফিসিয়াল : অফিসিয়াল ৪ জন। ২ জন রেফারি, ১ জন সময় রক্ষক ও একজন স্কোরার।

৯. বল : বল হবে গোলাকার, চামড়া বা কৃত্রিম পদার্থের তৈরি। বাইরের আবরণ পিচ্ছিল হবে না।

১০. দল গঠন : ১২ জন খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠিত হয়। ৬ জন মাঠ খেলোয়াড় ও ১ জন গোলরক্ষক হিসেবে খেলবে। বাকি ৫জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে থাকবে।

১১. গোলরক্ষকের জন্য কী কী নিষিদ্ধ

ক. বিপজ্জনকভাবে না খেলা।

খ. বলসহ গোলসীমার বাইরে আসতে পারবে না।

গ. গোলসীমার বাইরে বল ধরে গোলসীমার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

ঘ. পেনাল্টি থ্রো করার সময় থ্রোয়ার হাত থেকে বল ছাড়ার পূর্বে ৪ মিটার লাইন বা তার বর্ধিত অংশ অতিক্রম করতে পারবে না।

ঙ. বল আয়ত্তে থাকার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে নিজস্ব গোললাইন বা গোলপোস্টের উপর দিয়ে বাইরে খেলাতে পারবে না।

১২. একজন খেলোয়াড় কী করতে পারে না?

ক. ৩ সেকেন্ডের বেশি বল ধরে রাখতে পারে না।

খ. বল ধরে ৩ পদক্ষেপের বেশি নিতে পারে না।

গ. বল ধরার সময় ধাক্কা বা আঘাত করতে পারে না।

ঘ. বল হাঁটুর নিচে লাগলে তা বৈধ।

১৩. থ্রো–অফ : খেলা শুরু ও গোল হওয়ার পর থ্রো–অফের মাধ্যমে খেলা শুরু হয়।

১৪. যে যে কারণে ফ্রি-থ্রো দেওয়া হয়—

ক. ত্রুটিপূর্ণ খেলোয়াড় বদলি করলে।

খ. অবৈধভাবে খেলোয়াড় মাঠে প্রবেশ করলে।

গ. গোলরক্ষক নিয়মভঙ্গ করলে।

ঘ. মাঠে খেলোয়াড় গোলসীমা আইন ভঙ্গ করলে।

ঙ. ইচ্ছাকৃতভাবে পার্শ্ব বা আউটার গোল লাইন অতিক্রম করে বল খেললে।

চ. প্রতিপক্ষের প্রতি অবৈধ আচরণ করলে।

ছ. ত্রুটিপূর্ণ থ্রো-অফ ও থ্রো-ইন করলে।

জ. মারামারি করলে।

১৫. পেনাল্টি থ্রো দেওয়ার কারণ

ক. মাঠের যেকোনো স্থানে একজন খেলোয়াড় অবৈধভাবে আক্রমণকারীর একটি নিশ্চিত গোলের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিলে।

খ. গোলরক্ষক মাঠ থেকে বল নিয়ে গোলসীমায় প্রবেশ করলে।

গ. কোনো খেলোয়াড় ইচ্ছাকৃতভাবে যদি নিজ গোলসীমায় গোলরক্ষকের নিকট বলটি ব্যাকে পাস করে এবং গোলরক্ষক বলটি স্পর্শ করলে।

ঘ. একটি নিশ্চিত গোল করার সময় যদি কোনো অবৈধ বাঁশির আওয়াজে গোল নষ্ট হয়।

কলাকৌশল : হ্যান্ডবলের কলাকৌশলগুলো সাধারণত ১. বল ধরা, ২. বল পাস দেওয়া, ৩. গোলে বল মারা, ৪. বাধা দেওয়া।

১. বল ধরা : বল ধরার সময় হাতের আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে বলের দিকে দৃষ্টি দেবে এবং হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল ধরে কনুই ভেঙে বলটাকে নিজের দেহের কাছাকাছি টেনে নেবে। বলের গতি ও অবস্থান বিশেষ কাঁধ বরাবর, কোমরের নিচে, মাথার উপর থেকে লাফিয়ে বা দাঁড়ানো অবস্থায় বল ধরা যায়। গড়ানো বল পাশে বা সামনে ধরা যায়।

২. বল পাস দেওয়া : নিজের দলের কাছে বল পাস দেওয়াটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। যেহেতু হ্যান্ডবলের ওজন অনেকটা হালকা ও ছোট সেহেতু বলকে এক হাতে ছুড়ে পাস দেওয়াটাই অনেক সুবিধাজনক। তবে

অবস্থা অনুসারে দুই হাতেও পাস দেওয়া যায়। এক হাতে ছুড়ে পাস দেওয়ার সময় বলটাকে সাধারণত ডানহাতে ঠিকভাবে ধরে কাঁধের লাইনের পিছনে হাতটা নিয়ে বাম পায়ের উপর ভর রেখে ছুড়তে হয়। বল পাস বিভিন্নভাবে হতে পারে।

ক. কাঁধ বরাবর পাস, খ. কব্জি ঘুরিয়ে পাস, গ. হাত কোমরের নিচে এনে পাস, ঘ. মাথার উপর দিয়ে পাস ইত্যাদি।

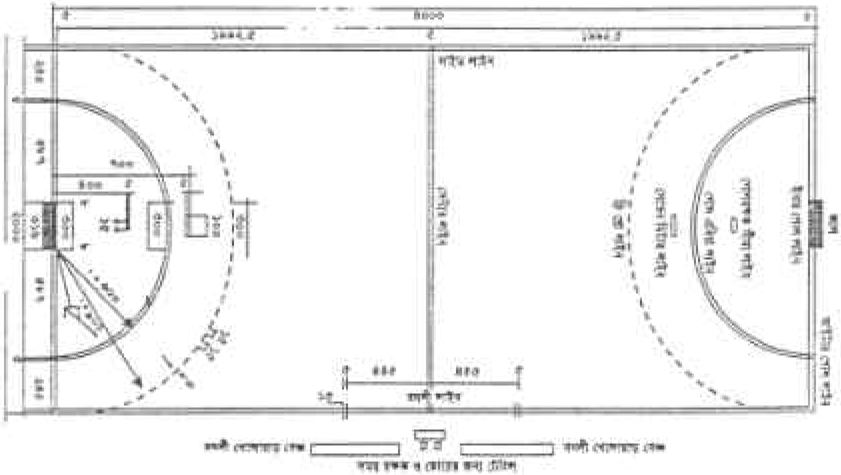

হ্যান্ডবল মাঠ

৩. গোলে বল ছোড়া : হ্যান্ডবলে গোল করতে হলে বল ছুড়ে মারাটাকে ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে। বল ছুড়ে গোল করাটা কঠিন ব্যাপার। কারণ একটা নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে থেকে গোল করতে হয় এবং গোলের আকারটাও বেশ ছোট। বলকে বিভিন্ন কায়দায় ছুড়ে গোল করা যায়। যেমন– সরাসরি ছুড়ে মারা, পাস দিয়ে ছুড়ে মারা, লাফিয়ে ছুড়ে মারা, বাউন্স করে মারা ইত্যাদি।

এক হাত দ্বারা পাসিং

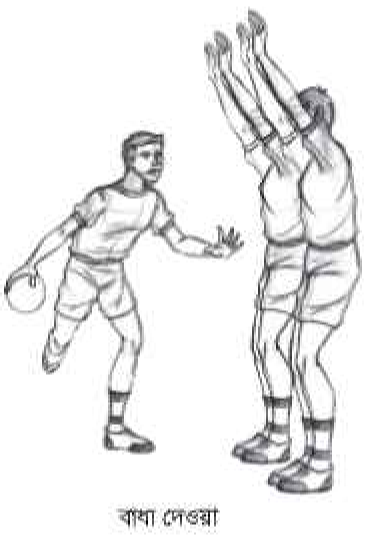

বাধা দেওয়া

৪. বাধা দেওয়া : যখন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় বলটাকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তাকে এমনভাবে বাধা দিতে হবে যাতে সে বলটাকে নিজ দলের অপর খেলোয়াড়কে বা গোলে ছুড়ে দিতে না পারে। এজন্য একাকী বা দুই তিনজন মিলে হাত তুলে প্রাচীর তৈরি করে বা শরীরের অংশ দিয়ে বাধা দিতে হবে।

কাজ–১ : ফি থ্রো দেওয়ার কারণগুলো পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করো।

কাজ–২ : বল ধরার কৌশলগুলো প্রদর্শন করো।

কাজ–৩ : গোলে বল ছোড়ার সময় শরীরের পজিশনগুলো ব্যাখ্যা করো।

অনুশীলনী

১. কোনটি হ্যান্ডবল খেলার কলাকৌশল?

ক. বল ধরা　　খ. স্টিক ধরা

গ. শ্যুটিং　　ঘ. কোমর ধরা

২. নিচের কোনটি থেকে বল সরাসরি জালে প্রবেশ করলেও রেফারি গোল ঘোষণা করেন না?

ক. কর্নার কিক　　খ. গোল কিক

গ. ডাইরেক্ট ফ্রি কিক　　ঘ. ইন ডাইরেক্ট ফ্রি কিক

৩. বাস্কেটবল খেলতে প্রধানত যে সকল বিষয় লক্ষ করা যায় তা হলো–

i. সংরক্ষিত এলাকায় ৩ সেকেন্ড পর্যন্ত থাকতে পারে

ii. বল ফ্রি থ্রো থেকে স্কোর হলে ১ পয়েন্ট পাবে

iii. খেলোয়াড়ের দম, ক্ষিপ্রতা, গতি ও লাফ দেয়ার ক্ষমতা থাকবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

A	B	C
১০০X৬০ গজ খেলার মাঠ	৪০X২০ মিটার খেলার মাঠ	১১৫X৭৫ গজ খেলার মাঠ

৪. A চিহ্নিত চিত্রটি কোন খেলার মাঠ নির্দেশ করে?

ক. ফুটবল　　খ. হ্যান্ডবল

গ. হকি　　ঘ. বাস্কেটবল

৫. উদ্দীপকে B ও C মাঠের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলায় মিল রয়েছে–

i. অফসাইড

ii. ড্রিবলিং

iii. পাসিং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আরিফ একজন গোল কিপার। সে মাঝে মাঝে মাঠ খেলোয়াড় হিসেবেও খেলে কিন্তু সে ফাউল করায় রেফারি তার বিপক্ষে একটি ফ্রি থ্রো দিলেন।

৬. আরিফ কোন খেলার খেলোয়াড়?

ক. ফুটবল খ. হ্যান্ডবল

গ. বাস্কেটবল ঘ. হকি

৭. রেফারি আরিফের বিপক্ষে ফ্রি থ্রো দিতে পারে–

i. মাঠ থেকে বল নিয়ে গোল সীমায় প্রবেশ করলে

ii. বল ধরে তিন স্টেপের বেশি দৌড়ালে

iii. মাঠ থেকে বল নিয়ে গড়িয়ে গেলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মাঠে ক্রিকেট খেলার সময় বোলার ব্যাটসম্যান মনিরের বিরুদ্ধে বল করে। বলটি ব্যাটসম্যানের পায়ে লাগলে বোলারসহ কয়েকজন সমস্বরে আউটের আবেদন করে। কিন্তু আম্পায়ার মাথা নেড়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ১০ম ওভারে নতুন ব্যাটসম্যান শাকিল তার প্রথম বলটি খেলতে গেলে বল সরাসরি স্টাম্পে লেগে বেল পড়ে যায় কিন্তু আম্পায়ার ডান হাত প্রসারিত করে সংকেত দেখালে ফিল্ডারদের মধ্যে হতাশা লক্ষ করা যায়।

ক. বাই রান কাকে বলে?

খ. ডেলিভারি কোন কৌশলের অংশ? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে সমস্বরে আউটের জন্য আবেদন করার কারণটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আম্পায়ারের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

২. আন্তঃশ্রেণি টি২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা টসে জিতে ১ম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বেশ কিছু ক্যাচ মিস করায় এবং বাউন্ডারি ঠেকাতে না পারায় ওপেনিং জুটি ১০০ রানের পার্টনারশিপ গড়ে তুলে এবং ২ উইকেটে ১৮০ রানের বিশাল স্কোর করে। ১৮১ রানে টার্গেটে খেলতে নেমে ১ম ওভারেই ওপেনিং ব্যাটসম্যানের পায়ে সরাসরি বল লাগায় আম্পায়ার তাকে আউট ঘোষণা করেন। ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা মাঠে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত ছিল। প্রতিপক্ষের বেশ কিছু নিশ্চিত বাউন্ডারি তারা রক্ষা করেন এবং কোনো ক্যাচ মিস করেনি। ফলে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা টার্গেট অতিক্রম করতে পারেনি।

ক. বাস্কেটবলের উপর কয়টি প্যানেল থাকবে?

খ. লোনা বল বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. ওপেনিং ব্যাটসম্যানের আউটটি কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সফলতার পিছনে কী কাজ করেছে বলে তুমি মনে কর- তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার

ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যম হচ্ছে অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার। অ্যাথলেটিকসের মধ্যে রয়েছে দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপ জাতীয় ইভেন্টসমূহ। আদিম যুগে মানুষ বাঁচার তাগিদে দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপের আশ্রয় গ্রহণ করত। মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনে এই দৌড়, লাফ, নিক্ষেপই চিত্তবিনোদন ও ব্যক্তিগত ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আগের যুগে সাঁতারের কলাকৌশল ও আইন-কানুনের তেমন প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে সুস্বাস্থ্য গঠন, চিত্ত-বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হলো সাঁতার। অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্য গঠন, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের পারদর্শিতা অর্জন, শৃঙ্খলা ও আনুগত্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

দৌড়

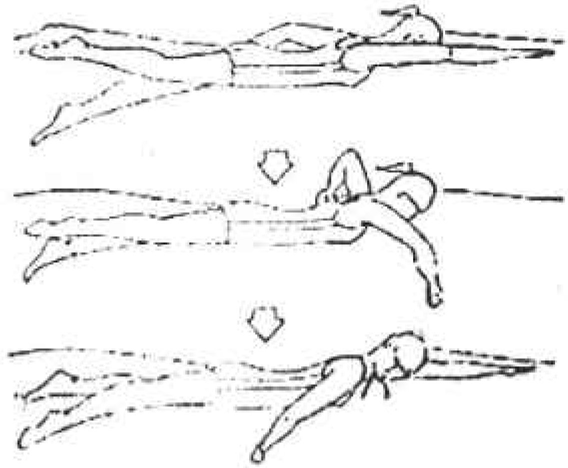

সাঁতার

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অ্যাথলেটিকসের ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টের কলাকৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন ইভেন্টের অ্যাথলেটদের যোগ্যতা ও গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন ইভেন্টের সাঁতারুদের যোগ্যতা ও গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- সাঁতারের বিভিন্ন ইভেন্টের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাঁতারের বিভিন্ন ইভেন্টের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিয়ম মেনে অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন ইভেন্ট অনুশীলন করতে পারব।
- নিয়ম মেনে সাঁতার অনুশীলন করতে পারব।

পাঠ–১ : অ্যাথলেটিকসের ইভেন্টসমূহের (ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড) নিয়মাবলি : পৃথিবীতে যত প্রকার খেলাধুলা চালু আছে তার মধ্যে দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপই সবচেয়ে প্রাচীন। একটি মানবশিশু জন্মের পর তার বেড়ে উঠার বিভিন্ন পর্যায়ে দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। আদিম যুগে মানুষ প্রাণ ধারণের জন্য শিকার ও প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে দৌড় ও লাফ দিতে হতো। আবার শিকার বা শত্রুকে ঘায়েল করতে নিক্ষেপের সাহায্যে নিতে হতো। এই দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপ তাদের জীবনযাপনের কাজে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে এই দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপই ব্যক্তিগত পারদর্শিতা ও চিত্তবিনোদনের ক্রীড়াতে রূপান্তরিত হয়েছে।

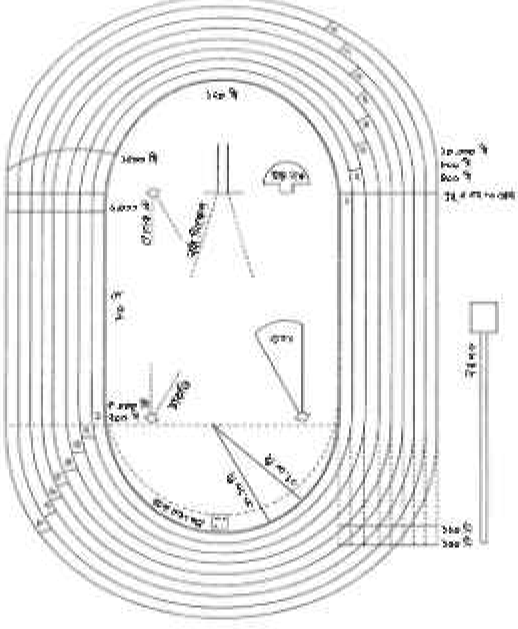

অ্যাথলেটিকস ট্র্যাক

অ্যাথলেটিকসের ইভেন্টসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

অ্যাথলেটিকস

- ট্র্যাক ইভেন্টস
  - দৌড়সমূহ
    - ১. ১০০ মি. স্প্রিন্ট
    - ২. ২০০ মি. স্প্রিন্ট
    - ৩. ৪০০ মি. স্প্রিন্ট
    - ৪. ৮০০ মি. দৌড়
    - ৫. ১৫০০ মি. দৌড়
    - ৬. ৫০০০ মি. দৌড়
    - ৭. ১০,০০০ মি. দৌড়
    - ৮. ৪ × ১০০ মি. রিলে
    - ৯. ৪ × ৪০০ মি. রিলে
    - ১০. ১০০ মি. হার্ডল
    - ১১. ১১০ মি. হার্ডল
    - ১২. ৪০০ মি. হার্ডল
    - ১৩. ৩০০০ মি. স্টিপল চেজ
  - হাঁটাসমূহ
    - ১. ম্যারাথন (২৬ মাইল, ৩৮৫ গজ)
    - ২. ২০ কি.মি. হাঁটা
    - ৩. ৫০ কি.মি. হাঁটা
- ফিল্ড ইভেন্টস
  - লাফসমূহ
    - ১. দীর্ঘলাফ
    - ২. উচ্চলাফ
    - ৩. ট্রিপলজাম্প
    - ৪. পোলভল্ট
  - নিক্ষেপসমূহ
    - ১. গোলক নিক্ষেপ
    - ২. চাকতি নিক্ষেপ
    - ৩. বর্শা নিক্ষেপ
    - ৪. হ্যামার নিক্ষেপ

উল্লেখ্য যে, ৫০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার দৌড়, ৪ × ৪০০ মি রিলে দৌড়, হার্ডল দৌড়, ৩০০০ মি. স্টিপল চেজ, হাঁটার ইভেন্টস ও হ্যামার নিক্ষেপ আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় না।

দৌড় প্রতিযোগিতার সাধারণ নিয়মাবলি

১. দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ৪০০ মিটার ট্র্যাক আইনসম্মত ট্র্যাক।

২. দৌড়ের সময় অ্যাথলেটগণ বামপাশ ১ম লেনের দিকে রেখে দৌড়াবে।

৩. স্প্রিন্ট অর্থাৎ ১০০ মি. ২০০ মি. ৪০০ মি. হার্ডল দৌড়, ১০০ × ৪ মি. দৌড়ের সময় লেন পরিবর্তন করা যাবে না। যার যার নির্দিষ্ট লেনে দৌড়াতে হবে।

৪. ৮০০ মি, ১৫০০ মি ও ৪ × ৪০০ মি রিলে দৌড়ের সময় লেন পরিবর্তন করা যাবে। কখন কীভাবে লেন পরিবর্তন করতে হবে তা দৌড় শুরু হওয়ার আগেই ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

৫. স্প্রিন্ট-এর জন্য স্টার্টিং ব্লক ব্যবহার করতে হবে। তবে অন্যান্য দৌড়ের ক্ষেত্রে স্টার্টিং ব্লক ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়।

৬. দৌড়ের শেষ মাথায় দুইটি ফিনিশিং স্ট্যান্ড থাকবে।

৭. ফিনিশিং ফিতায় 'টর্সো' আগে স্পর্শ করাতে হবে।

৮. দৌড়ের আরম্ভ ও শেষ রেখা সাদা রং দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।

টর্সো

৯. সব দৌড়ের আরম্ভ এক জায়গা থেকে হয় না, কিন্তু শেষ হয় একই স্থানে।

১০. আরম্ভকারীর পিস্তলের আওয়াজে সব দৌড় শুরু হবে।

১১. স্প্রিন্ট দৌড় আরম্ভের সময় আরম্ভকারী তিনটি শব্দ ব্যবহার করবে।

ক. On your mark অর্থাৎ আরম্ভ স্থানে যাও।

খ. Set অর্থাৎ দৌড় শুরুর চূড়ান্ত অবস্থান।

গ. Fire বা পিস্তলের আওয়াজ।

১২. একবার ফলস স্টার্ট হলে সে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ যাবে।

১৩. দূরপাল্লার দৌড়ের আরম্ভের সময় Set ব্যবহার করতে হয় না শুধু On your mark বলার পরেই বন্দুকের আওয়াজ হয়।

স্প্রিন্ট দৌড়ের কৌশল : সর্বোচ্চ গতিবেগসম্পন্ন দৌড়কে স্প্রিন্ট বলে। ১০০ থেকে ৪০০ মিটার পর্যন্ত সব রকম দৌড় স্প্রিন্ট দৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। স্প্রিন্ট দৌড়ের স্টার্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সঠিক স্টার্ট হলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।

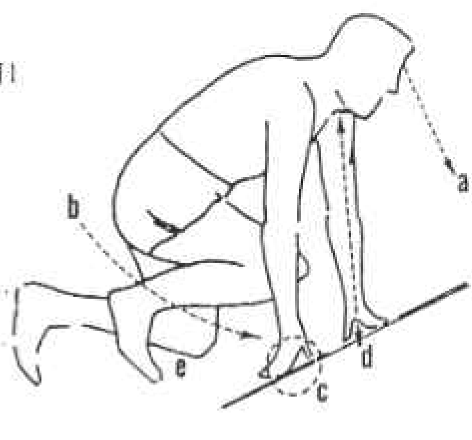

দৌড় আরম্ভ

তিনভাবে স্প্রিন্ট দৌড়ের স্টার্ট নেওয়া যায়–

১. বাঞ্চ স্টার্ট (Bunch Start)

২. মিডিয়াম স্টার্ট (Medium Start)

৩. অ্যালোংগেটেড স্টার্ট (Elongated Start)

১. বাঞ্চ স্টার্ট : সামনের পা আরম্ভ রেখা থেকে এক পা পিছনে এবং পিছনের পায়ের টিপ সামনের পায়ের হিলের সাথে এক লাইনে থাকবে।

২. মিডিয়াম স্টার্ট : সামনের পা আরম্ভ রেখা থেকে দুই পা পিছনে এবং পিছনের পায়ের হাঁটু ও সামনের পায়ের বল এক লাইনে থাকবে।

৩. অ্যালোংগেটেড স্টার্ট : সামনের পা আরম্ভ রেখা থেকে তিন পা পিছনে এবং পিছনের পায়ের হাঁটু ও সামনের পায়ের হিল এক লাইনে থাকবে।

স্প্রিন্ট দৌড়ের চারটি পর্যায় (Phase) আছে।

১. আরম্ভ রেখার অবস্থান (On your mark)

২. দৌড় শুরুর পূর্ব মুহূর্তের অবস্থান (Set)

৩. ব্লক থেকে উঠা (Drive)

৪. গতিবেগ বৃদ্ধি করা (Acceleration)

১. আরম্ভ রেখার অবস্থান : আরম্ভকারী On your mark বলার সাথে সাথে অ্যাথলেটগণ আরম্ভ রেখার পিছনে ২০–২৫ সে:মি: দূরে পা রেখে এবং আরম্ভ রেখা বরাবর দুইহাতের আঙুল মাটিতে রাখতে হবে। স্টার্টিং ব্লকে পা রাখলে তা নির্দিষ্ট জায়গায় আগেই রাখতে হবে। দৃষ্টি সামনের দিকে থাকবে। হাঁটু ভেঙে হাতের তালুতে ভর দিয়ে বসতে হবে।

২. দৌড় শুরুর পূর্ব মুহূর্তের অবস্থান : আরম্ভকারী সেট বলার সাথে সাথে পিছনের পা'কে সোজা করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হবে। কোমর উপরে উঠবে। শরীরের সম্পূর্ণ ভর থাকবে হাতের উপর । এ সময় স্থির হয়ে থাকতে হবে এবং ২–৩ সেকেন্ডের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাবে।

৩. ব্লক থেকে ওঠা : বন্দুক/পিস্তলের আওয়াজ শোনার সাথে সাথে উঠে না দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যেতে হবে।

৪. গতিবেগ বৃদ্ধি করা : এরপরই গতিবেগ বৃদ্ধি করে দৌড়াতে হবে। ছবির সাহায্যে এ চারটি অবস্থান দেখানো হলো–

স্টার্টিং এর বিভিন্ন পর্যায়

দাঁড়িয়ে আরম্ভ : মধ্যম ও দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় দাঁড়িয়ে আরম্ভ নিতে হয়। আরম্ভকারী On your mark বলার সাথে সাথে আরম্ভ রেখায় এসে দাঁড়াবে। তারপর বন্দুকের আওয়াজ শুনে দৌড় শুরু করবে।

দৌড় সমাপ্ত : সমস্ত দৌড় একই জায়গায় শেষ হবে। শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যখন একই রেখায় সমাপ্তি রেখায় আসবে তখন দৌড় সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরা হবে।

রিলে দৌড় : একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ৪ জন প্রতিযোগী সমান দূরত্বে ব্যাটন/কাঠি নিয়ে দৌড়ায় তখন তাকে রিলে দৌড় বলে।

১. হাতে ব্যাটন নিয়ে দৌড়াতে হবে।

২. ব্যাটন বদলের জায়গায় ব্যাটন পরিবর্তন করতে হবে।

৩. ব্যাটন বদলের জায়গা ২০ মিটার।

৪. ব্যাটনের দৈর্ঘ্য ২৮--৩০ সেমি, পরিধি ৩৮ মি.মি.।

৫. ব্যাটন কাঠ, ধাতু বা ঐ জাতীয় বস্তু দ্বারা তৈরি হবে।

৬. ব্যাটন বদলের পর যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে হবে যতক্ষণ না অন্যান্য প্রতিযোগী তাকে অতিক্রম করে।

দেখে ব্যাটন বদল ব্যাটন বদল না দেখে ব্যাটন বদল

ব্যাটন বদলের কৌশল :ব্যাটন বদলের সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দৌড়ের গতিবেগ যেন না কমে। সেজন্য ব্যাটন বদলের কৌশলের অনুশীলন বারবার করতে হয়। ব্যাটন বদলের কৌশল দু রকমের-(১) দেখে বদল (২) না দেখে বদল।

১. দেখে বদল : যখন ব্যাটন বদলের সময় পিছনের দিকে দেখে ব্যাটনটি বদল করে তখন তাকে দেখে বদল বলে।

২. না দেখে বদল: বদলের সময় পিছন থেকে স্পিডে দৌড়ে এসে না দেখে হাত থেকে ব্যাটনটি গ্রহণ করে তাকে না দেখে বদল বলে।

ব্যাটন পাসের নিয়ম : ব্যাটন পাসের কৌশল দু রকমের :

১. উপরের দিকে ধরে পাস (Upward pass)

২. নিচের দিকে ধরে পাস (Downward pass)

১. উপরের দিক পাস : ব্যাটনটি হস্তান্তর করার সময় যদি ব্যাটনটির মাথা উপরের দিকে ধরে পাস করা হয় তাকে আপওয়ার্ড পাস বলে।

২. নিচের দিকে ধরে পাস : ব্যাটনটি হস্তান্তর করার সময় ব্যাটনটির মাথা যদি নিচের দিকে ধরে পাস করা হয় তাহলে তাকে ডাউনওয়ার্ড পাস বলে।

যেভাবেই পাস করা হোক না কেন এটা নির্ভর করে অনুশীলনের উপর।

কাজ–১ : স্প্রিন্ট দৌড়ের স্টার্ট কীভাবে নিতে হয় মাঠে গিয়ে দেখাও।
কাজ–২ : দৌড়ের সমাপ্তি রেখা স্পর্শ করার কৌশলগুলো গ্রুপ করে দেখাও।
কাজ–৩ : দেখে বা না দেখে ব্যাটন বদলের কৌশলগুলো বর্ণনা করো ও মাঠে প্রদর্শন করো।

পাঠ–২ : লাফ বিভাগ : লাফ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ক. লংজাম্প, খ. হাইজাম্প, গ. হপস্টেপ এন্ড জাম্প, ঘ. পোলভল্ট।

ক. লংজাম্প বা দীর্ঘলাফ-এর সাধারণ নিয়মাবলি

১. অ্যাপ্রোচ রান : রানওয়ের ভিতর দিয়ে দৌড়ে আসতে হবে।

২. রানওয়ের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৪০ মিটার, প্রস্থ ১.২২-১.২৫ মি:, উভয় পার্শ্ব সাদা রং দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।

৩. টেক অফ বোর্ডের থেকে জাম্প পিট-এর দৈর্ঘ্য ১.২১–১.২২ মিটার, চওড়া ১৯.৮ – ২০.২ সে.মি. এবং উচ্চতা ১০০ সে.মি.।

৪. টেক অফ বোর্ড থেকে জাম্পপিট ১–৩ মি. দূরে থাকবে।

৫. জাম্প পিটের মাপ–দৈর্ঘ্য ১০ মি., প্রস্থ ২.৭৫–৩ মি.।

৬. টেক অফ বোর্ডের রং হবে সাদা।

৭. জাম্পপিট বালি দ্বারা ভরা থাকবে, তবে তা টেক অফ বোর্ডের উপরে উঠবে না।

৮. শরীরের যে অংশ সবচেয়ে বেশি বালি স্পর্শ করবে সেখান থেকে মাপ নিতে হবে।

৯. একজন প্রতিযোগী অযোগ্য হবে —

ক. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের ভিতর লাফ দিতে ব্যর্থ হলে।

খ. টেক অফ বোর্ডের বাইরে দিয়ে লাফ দিলে।

গ. ল্যান্ডিং-এর পূর্বে ল্যান্ডিং এরিয়ার বাইরের মাটি স্পর্শ করলে।

ঘ. লাফ শেষ করে পিছনের দিকে হেঁটে এলে।

ঙ. দু পায়ে টেক অফ নিলে।

চ. টেক অফ বোর্ডের সামনের মাটি স্পর্শ করলে।

দীর্ঘ লাফের কৌশল : যারা ভালো স্প্রিন্টার তারা দীর্ঘলাফে ভালো করে। একজন ভালো লং জাম্পার হতে হলে তার শক্তি ও গতি প্রয়োজন যা স্প্রিন্টারের মধ্যে আছে । দীর্ঘলাফের কৌশলকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. অ্যাপ্রোচ রান (দৌড়ে আসা), ২. টেক অফ (মাটিতে ভর দিয়ে উপরে উঠা), ৩. ফ্লাইট (শূন্যে ভাসা), ৪. ল্যান্ডিং (মাটিতে অবতরণ)

১. অ্যাপ্রোচ রান : লাফ দেওয়ার জন্য ৫০ থেকে ৮০ ফুট দূর থেকে তীব্র গতিতে দৌড়ে আসাকে অ্যাপ্রোচ রান বলে। শেষের পদক্ষেপগুলো খুব দ্রুত হবে। টেক অফ বোর্ডে ঠিকমতো পা পড়ার জন্য ১৫-২৫ ফুট দূরে একটি টেকঅফের জন্য চিহ্ন দিতে হয়। একে চেক মার্ক বলে। এই চেক মার্কে ঠিকমতো পা পড়লে মনে করতে হবে টেক অফ বোর্ডে ঠিকমতো পা পড়বে। টেক অফ বোর্ডে ঠিকমতো পা পড়ার জন্য একজন অ্যাথলেটকে বারবার অনুশীলন করতে হয়।

২. টেক অফ : দীর্ঘ লাফে মাটি ছেড়ে উপরে উঠার জন্য কাঠের তৈরি একটি টেক অফ বোর্ড থাকে। এই বোর্ডটি ৪ ফুট লম্বা, ৮ ইঞ্চি চওড়া হয়। উপরিভাগে সাদা রং দিতে হয়। এই বোর্ডের উপর পা দিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠাকে টেক অফ বলে। যার টেক অফ ভালো হবে সে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে বেশি।

৩. ফ্লাইট : টেক অফ বোর্ডে পা দিয়ে উপরে উঠার পর থেকে মাটিতে নামার আগ পর্যন্ত সময় হচ্ছে ফ্লাইট বা শূন্যে ভাসা। শূন্যে বায়ুর মধ্যে হাঁটা, হাঁটু গুটিয়ে নেওয়া, ঝাঁকুনি দিয়ে খুব জোরে পা ছোড়া হিচকিক (Hitch Kick) এগুলো হলো শূন্যে ভাসার পদ্ধতি। শূন্যে যার পায়ের মুভমেন্ট ভালো হবে সে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে।

৪. ল্যান্ডিং : মাটিতে অবতরণের সময় পা মাটিকে স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্তে পা দুটোকে সামনের দিকে সম্পূর্ণ সোজা করে নিতে হবে যাতে বেশি দূরত্বে যাওয়া যায়। গোড়ালি দুটো ল্যান্ডিং পিটের প্রথম বালি স্পর্শ করবে এবং সাথে সাথে দু হাঁটু ভেঙে গোড়ালি থেকে পায়ের পাতায় শরীরের ভর নিয়ে আসতে হবে। তারপর সামনে গড়িয়ে পড়তে হবে।

কাজ–১ : দীর্ঘলাফের টেক অফ ঠিকমতো নিতে পারছে কি না তা দেখাও।

কাজ–২ : ল্যান্ডিং-এর সময় পায়ের অবস্থান যথাযথ হচ্ছে কি না তা করে দেখাও।

পাঠ–৩ : উচ্চলাফ

উচ্চলাফের নিয়মাবলি

১. উচ্চলাফ শুরুর পূর্বে প্রতিযোগীদের লাফের উচ্চতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং প্রতি রাউন্ড উচ্চতা কী পরিমাণ বাড়াতে হবে তা ঘোষণা করতে হবে।

২. রাউন্ড শেষে কমপক্ষে ২ সেন্টিমিটার উঠাতে হবে।

৩. রানওয়ের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ১৫ মিটার হবে।

৪. একজন প্রতিযোগী তার সুবিধার জন্য রানআপ ও টেক অফ মিলানোর জন্য একাধিক মার্কার ব্যবহার করতে পারবে।

৫. দুই খুঁটির মধ্যে দূরত্ব থাকবে ৩.৬৪ মিটার থেকে ৪ মিটার।

৬. ক্রসবার ধাতু, কাঠ বা ঐ জাতীয় কোনো বস্তু দ্বারা তৈরি হবে।

৭. উচ্চলাফের ল্যান্ডিং এরিয়ার মাপ ৫ × ৪ মিটার।

৮. একজন প্রতিযোগী কখন একটি সুযোগ হারায়–

ক) নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে লাফ দিতে না পারলে।

খ) লাফ দেওয়ার সময় ক্রসবারের লাইন অতিক্রম করলে।

গ) দু পায়ে টেক অফ নিলে।

ঘ) লাফ দেওয়ার সময় ক্রসবার পড়ে গেলে।

উচ্চলাফের কৌশল : যে কৌশলেই লাফ দেওয়া হোক না কেন, লাফ দেওয়ার সময় চারটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়।

১. অ্যাপ্রোচ রান, ২. টেক অফ, ৩. ক্রসবার অতিক্রম করা, ৪. ল্যান্ডিং

১. দৌড়িয়ে আসাকে অ্যাপ্রোচ রান বলে।

২. দৌড়িয়ে এক পায়ে ভর দিয়ে উঠাকে টেক অফ বলে।

৩. যেকোনো পদ্ধতিতে ক্রসবারটি অতিক্রম করতে হবে।

৪. ক্রসবার অতিক্রমের পর মাটিতে পড়াকে ল্যান্ডিং বলে।

উচ্চ লাফ দেওয়ার পদ্ধতি তিন প্রকার–

১. ওয়েস্টার্ন রোল ২. বেলি রোল ৩. ফসবেরি ফ্লপ

১. ওয়েস্টার্ন রোল : এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো যে পায়ে টেক অফ নেবে, দু হাত ও সেই পায়ের উপরই ল্যান্ডিং হবে। বাম পায়ের উপর টেক অফ নিলে ক্রসবার অতিক্রম করার পর বাম পায়ের উপরই ল্যান্ডিং হবে।

ক. সাধারণত সাত পদক্ষেপ দৌড়ে এসে লাফ দেওয়া হয়। উচ্চতা কম হলে পাঁচটি পদক্ষেপই যথেষ্ট।

খ. লাফানোর জন্য দৌড় শুরু করার সময় ক্রসবারের সাথে ৪৫° থেকে ৬০° কোণ সৃষ্টি করে দাঁড়াতে হবে।

গ. মাটি ছেড়ে উঠার সময় শেষের তিনটা পদক্ষেপ দ্রুত এবং অপেক্ষাকৃত লম্বা হবে।

ঘ. পিছনের পাকে খুব জোরে উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে যে পায়ের উপর ভর দিয়ে মাটি ছাড়তে হবে সেই পায়ের গোড়ালি থেকে পাতার উপর সম্পূর্ণ শরীরটাকে গড়িয়ে এনে পাকে সোজা করে মাটি ছেড়ে উপরে উঠাতে হবে।

ঙ. যে পা দিয়ে মাটি ছাড়া হবে, পরে সেই পায়ের হাঁটু ভেঙে উপরে তুলতে হবে।

চ. ক্রসবারের উপর সম্পূর্ণ শরীরটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে সে দিকের কাঁধকে ক্রসবারের উপর খাড়াভাবে রেখে ক্রসবার অতিক্রম করবে।

ছ. যে পায়ে ল্যান্ডিং সেই পা ও দু হাতের উপর ভর করে ল্যান্ডিং করতে হবে।

ওয়েস্টার্ন রোল

২. বেলি রোল : এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো যে পায়ে টেক অফ নিবে তার বিপরীত পা ও দু হাতের উপর ভর করে ল্যান্ডিং করতে হবে। ফোমের উপর হলে নিজের সুবিধা মতো পিঠের উপরও ল্যান্ডিং করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে মনে রাখতে হবে–

ক. দৌড়ে আসার কোণ ক্রসবারের সাথে ২৫°–৪০° হবে।

খ. টেক অফ এর সময় শেষের পদক্ষেপগুলো দ্রুত ও লম্বা হবে। তবে মাটি ছাড়ার পর বিপরীত পা ও সে দিকের হাতকে ক্রসবারের উপর প্রথমে নিয়ে যেতে হবে।

গ. ক্রসবারের উপরে এলে শরীরের উপরের অংশটাকে নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে হয়। তাতে পেটের দিকটাকে ক্রসবারের কাছাকাছি রাখা যায়।

ঘ. যে হাত ও পা প্রথমে নামছে সে দিকের দেহের উপরের অংশ (কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত) মাটিতে নামিয়ে হাতকে দেহের ভিতরের দিকে ঠেলে দিয়ে গড়িয়ে দিতে হবে।

বেলি রোল

৩. ফসবেরি ফ্লপ : ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকার ডিক ফসবেরি এক নতুন পদ্ধতিতে উচ্চ লাফ দিয়ে সোনার মেডেল পান তখন থেকে তার নামানুসারে এই ফসবেরি ফ্লপের প্রচলন হয়। এটা বর্তমানে সর্বজনীন পদ্ধতি। তবে মনে রাখতে হবে ফোমের ম্যাট ছাড়া এ পদ্ধতিতে লাফ দেওয়া সম্ভব নয়।

ক. ক্রসবারের সাথে ৯০° কোণ করে দাঁড়িয়ে দৌড় শুরু করতে হয় এবং অর্ধবৃত্তাকারে ক্রসবারের কাছে আসতে হয়।

খ. শরীরের মাঝখানটাকে পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে টেক অফ পা দেহের ভর কেন্দ্রের সামনে রাখতে হবে। এরপর দ্রুত জোরের সাথে উপরের দিকে উঠতে হবে। একই সাথে অপর পাটাকে দুলিয়ে উপরে ডান কাঁধের লাইনে নিয়ে যেতে হবে। তার ফলে পিঠ ক্রসবারের দিকে চলে আসবে।

গ. দেহ মাটি ছেড়ে যখনই উপরে উঠবে, সাথে সাথে হাত দুটো পাশে দেহের সমান্তরালে এনে মাথা মধ্য শরীর ও কোমরের নিচের অংশ ক্রসবারের উপর দিয়ে পার করতে হবে। হাত ও পা দুটো উপরের দিকে থাকবে এবং পিঠের উপর অবতরণ করবে।

ফসবেরি ফ্লপ

অ্যাথলেটিকসের টাই : টাই (Tie) অর্থ সমতা। যখন দু জনের ফলাফল সমান হয় তখন তাকে টাই বলে। টাই দুই রকমের– ১. উচ্চতার টাই ২. দূরত্বের টাই।

১. উচ্চতার টাই : পোলভল্ট ও হাইজাম্পে টাই হলে তাকে উচ্চতার টাই বলে। কারণ এদের টাই হয় উচ্চতায়।

২. দূরত্বের টাই : দীর্ঘলাফ হপস্টেপ এন্ড জাম্প, চাকতি নিক্ষেপ গোলক নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, হাতুড়ি নিক্ষেপ এসব ইভেন্টের প্রতিযোগীদের মধ্যে টাই হলে তাকে দূরত্বের টাই বলে। শুধু ১ম স্থানের জন্য টাই ভাঙতে হয়। ২য় ও ৩য় স্থানের জন্য টাই হলে যুগ্মভাবে ফলাফল ঘোষণা করতে হয়।

১. উচ্চতায় টাই হলে টাই ভাঙার নিয়ম–

ক) যে উচ্চতায় টাই হয়েছে সে উচ্চতায় যে কম চেষ্টায় অতিক্রম করেছে সে প্রথম হবে।

খ) উপরের নিয়মে টাই না ভাঙলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যার ব্যর্থতার সংখ্যা কম সে প্রথম হবে।

গ) এর পরেও যদি টাই না ভাঙে তাহলে উচ্চতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে লাফ দেওয়াতে হবে যে অতিক্রম করবে সে বিজয়ী হবে। এখানে প্রতিযোগীগণ ১টি করে লাফের সুযোগ পাবে।

দূরত্বের টাই হলে টাই ভাঙার নিয়ম

ক. মোট নিক্ষেপ বা লাফের ভিতর ২য় সর্বোচ্চ দূরত্ব দেখতে হবে।

খ. এ নিয়মে টাই না ভাঙলে ৩য় সর্বোচ্চ দেখতে হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে যাবে।

দীর্ঘলাফ, হপস্টেপ এন্ড জাম্প, শটপুট, চাকতি, হ্যামার ও বর্শা নিক্ষেপের টাই হলে সব টাই ভাঙার নিয়ম একই।

কাজ–১ : তোমরা যে পদ্ধতিতে লাফ দেওয়া পছন্দ কর উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে লাফ দিয়ে কৌশল দেখাও।
কাজ–২ : বেলি রোলের কৌশল বর্ণনা করো।

পাঠ–৪ : ট্রিপল জাম্প বা হপস্টেপ এন্ড জাম্প ও পোলভল্ট

১. ট্রিপল জাম্প : হপস্টেপ এন্ড জাম্প বা লাফ ঝাঁপ ধাপ অর্থাৎ এই তিনের সমন্বয়ে যে লাফ দেওয়া হয় তাকে ট্রিপল জাম্প বলে। যে পায়ে টেক অফ সে পায়ে প্রথমে হপ, বিপরীত পায়ে স্টেপ ও তার পরে লাফ দিতে হয়। এই ইভেন্টে তিনটি লাফই সমান গুরুত্ব বহন করে। এই তিনটি জাম্পের মধ্যে অনুপাত হিসেব করে লাফ দিলে অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। সাধারণত ৬ : ৫ : ৬ অনুপাত নতুন অ্যাথলেটদের জন্য সুবিধাজনক। প্রথম হপ ৬ হলে স্টেপ নিতে হবে ৫ এবং শেষে লাফ দিতে হবে ৬। প্রথমে বাম পায়ে টেক অফ নিলে সেই পায়ে হপ দিয়ে ডান পায়ে স্টেপ নিয়ে তারপর জাম্প দিতে হবে।

অ্যাপ্রোচ রান : দীর্ঘলাফের মতো দৌড়িয়ে আসতে হয়। দৌড়ের গতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন মাটি ছাড়ার সময় দৌড়ের গতি বেশি থাকে।

টেক অফ : দীর্ঘলাফ ও ট্রিপল জাম্প-এর টেক অফ এক নয়। ট্রিপল জাম্পের মাটি ছাড়ার সময় চেষ্টা থাকে যে, কীভাবে সামনের দিকের গতি বজায় রাখা যায়। প্রথম হপ খুব উঁচু করে নেওয়া ঠিক নয়। স্বাভাবিক হপ নিয়ে ক্রমান্বয়ে উঁচুতে উঠলে লাফটি ভালো হয়। হপ দিতে যে উচ্চতা নিতে হবে স্টেপ তা থেকে বেশি উচ্চতায় নিতে হবে। তা থেকেও বেশি উচ্চতায় লাফ দিতে হবে।

মাটির উপরে শূন্যে ভাসা : দীর্ঘলাফের সময় শূন্যে যেভাবে পায়ের নড়াচড়া করতে হয় এখানেও সেভাবে পায়ের নড়াচড়া করতে হবে তাহলে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা যাবে।

ল্যান্ডিং : দীর্ঘলাফের ল্যান্ডিং-এর কৌশল ও ট্রিপল জাম্পের ল্যান্ডিং-এর কৌশল একই।

নিয়মাবলি

১. যদি ৮-এর অধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে সেক্ষেত্রে ৩টি লাফের পর ৮ জনকে বাছাই করে ঐ আটজন আরও তিনটি করে লাফ দিবে। এই ছয় লাফের ভিতর যার দূরত্ব বেশি হবে সে বিজয়ী হবে।

২. লাফ দেওয়ার সময় টেকঅফ বোর্ডের সামনের যে বালির দেয়াল দেওয়া আছে তা ভেঙে ফেললে ঐ লাফটি বাতিল হবে।

৩. অ্যাপ্রোচ রানের সময় দৌড় পথে কোনো চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

৪. হাতে, পায়ে, কোনো ওজন বা গ্রিপ নিয়ে লাফ দেওয়া যাবে না।

৫. লাফ দেওয়ার সময় অপর পা মাটিতে স্পর্শ করলে ঐ লাফটি বাতিল হবে।

২. পোলভল্ট বা দণ্ডলাফ : পোল-এর উপর ভর দিয়ে যে লাফ দেওয়া হয় তাকে পোলভল্ট বা দণ্ডলাফ বলে।

প্রতিযোগিতার নিয়ম

১. প্রতিযোগিতা শুরু করার আগে উচ্চতা সম্পর্কে প্রতিযোগীদের অবহিত করবেন এবং প্রতি রাউন্ড শেষে কতটুকু উচ্চতা বাড়ানো হবে তাও বলে দেবেন।

২. প্রতি রাউন্ড শেষে ক্রসবার কমপক্ষে ৫ সে.মি. উপরে উঠবে।

৩. লাফ দেওয়ার সুবিধার জন্য প্রতিযোগীগণ বক্সের ভিতরের ধার থেকে রানওয়ের দিকে ০.৪ মিটার ও পিটের দিকে ০.৮ মিটার পর্যন্ত পোস্টদ্বয় সরাতে পারবেন।

৪. প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলে অনুশীলনের জন্য লাফের স্থান ব্যবহার করা হয় না।

৫. একজন প্রতিযোগীর লাফ কখন ব্যর্থ হবে–

ক. দু পা শূন্যে উঠে গেলে।

খ. যদি লাফের পর ক্রসবার পড়ে যায়।

গ. যদি ক্রসবারের সামনের ভূমি স্পর্শ করে।

ঘ. যদি লাফ না দিয়ে দণ্ড দিয়ে ক্রসবার ফেলে দেয়।

ঙ. যদি লাফের সময় দণ্ড ধরা অবস্থায় নিচের হাত উপরের হাতের উপরে নেয় বা দুই হাত পরিবর্তন করে বেয়ে বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করে।

৬. একজন প্রতিযোগী এক উচ্চতায় তিনটি করে লাফ দেওয়ার সুযোগ পাবে।

৭. পোল ভালো করে ধরার জন্য হাতে যেকোনো ধরনের পদার্থ লাগাতে পারবে।

৮. লাফ দেওয়ার সময় দণ্ডটি ভেঙে গেলে পুনরায় লাফ দেওয়ার সুযোগ পাবে।

৯. টাই হলে উচ্চতার টাই ভাঙার নিয়ম অনুসারে টাই ভাঙতে হবে।

১০. রানওয়ের দৈর্ঘ্য হবে ৪০ মিটার প্রস্থ হবে ১.২২ মিটার।

১১. ল্যান্ডিং-এর মাপ হবে দৈর্ঘ্য ৫ মিটার প্রস্থ ৫ মিটার।

১২. প্রত্যেক প্রতিযোগী নিজ নিজ দণ্ড ব্যবহার করবে।

কৌশল

পোল তিনভাবে ধরা যায়–

১. উঁচু করে বহন করা, ২. মধ্যমভাবে বহন করা, ৩. নিচুভাবে বহন করা।

কোনো প্রতিযোগী কীভাবে দন্ড ধরবে তা তাদের উচ্চতা ও অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। যে যেভাবেই ধরুক বক্সে দণ্ডের গোড়া ঢুকিয়ে লাফ দিতে হবে।

লাফ দেওয়ার ৬টি ধাপ

১. রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে আসা

২. পোল ঠিকমতো বক্সে প্রেস করা

৩. ঠিকমতো টেক অফ নেওয়া

৪. পোলে ভর দিয়ে উপরে উঠা

৫. বারের উপর শরীর দোল খাওয়ানো

৬. পোল ছাড়া ও শরীর ঘুরিয়ে ল্যান্ডিং করা

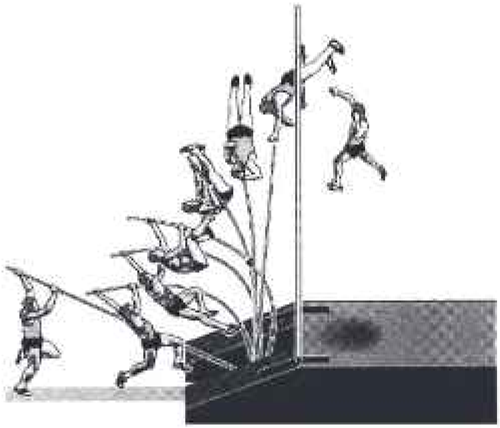

দণ্ড লাফ

কাজ–১ : পোল ধরে কীভাবে বহন করতে হয় দেখাও।

কাজ–২ : লাফ দেওয়ার ধাপ কয়টি বর্ণনা করো।

কাজ–৩ : ট্রিপল জাম্প দেওয়ার কৌশলগুলো প্রদর্শন করো।

পাঠ–৫ : নিক্ষেপ বিভাগ : আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিক্ষেপ বিভাগে গোলক, বর্শা ও চাকতি এই তিনটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই তিনটি ইভেন্টের নিয়মাবলি ও কলাকৌশল বর্ণনা করা হলো–

১. গোলক নিক্ষেপ : গোলকটি লোহা, পিতল বা ঐ জাতীয় কোনো বস্তু দ্বারা তৈরি হবে। আকৃতি গোলাকার এবং মসৃণ হবে । গোলকের ওজন পুরুষদের জন্য ৭.২৬০ কেজি। মহিলাদের জন্য ৪ কেজি। শট পুট সার্কেলের ব্যাস হবে ২.১৩৫ মি.। সেক্টরের কোণ হবে ৩৪.৯২°। একটি বাঁকানো কাঠের তৈরি স্টপ বোর্ড বৃত্তের সামনের দাগের উপর বসাতে হবে। স্টপ বোর্ডটি সাদা রঙের হবে এবং মাটিতে দৃঢ়ভাবে লাগানো থাকবে। পায়ের ধাক্কা লেগে যেন সরে না যায়।

গোলক নিক্ষেপের কৌশল : গোলকটি হাতের তালুতে না ধরে আঙুলের গোড়াসহ সম্পূর্ণ আঙুলের মধ্যে থাকবে। বুড়ো আঙুল ও কনিষ্ঠ আঙুল গোলকের দুইদিকে একটু ছড়িয়ে থাকবে যাতে পড়ে না যায়। এরপর গোলকটি গলা ও কাঁধের মাঝখানে রাখতে হবে এবং হাতের কনুই কিছুটা উঁচুতে থাকবে। যেদিকে গোলকটি ছোড়া হবে তার বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। ডান পা সামনে ও বাম পায়ের পাতাকে পিছনে নিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির কাছে রাখতে হবে। এরপর পাসহ শরীরকে পিছনে টেনে এনে শরীর পাশে ঘুরে আসবে।

নিয়মাবলি

১. গোলকটি সেক্টরের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে।

২. আটজন প্রতিযোগী হলে সবাই ৬টি করে নিক্ষেপ করার সুযোগ পাবে।

৩. আটের অধিক হলে প্রথমে ৩টি করে নিক্ষেপ করে বাছাই করতে হবে। বাছাইকৃত প্রতিযোগীগণ আরও তিনটি করে নিক্ষেপ করার সুযোগ পাবে।

৪. নিক্ষেপ শেষে বৃত্তের উপরে স্পর্শ করা যাবে না।

৫. গোলকটি মাটিতে না পড়া পর্যন্ত বৃত্ত থেকে বের হওয়া যাবে না।

৬. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের ভিতর নিক্ষেপ করতে হবে।

গোলক ধরা

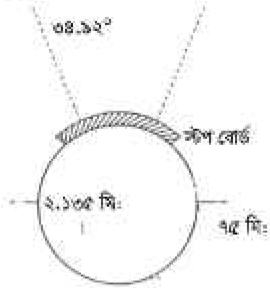

শটপুট সার্কেল ও সেক্টর

২. বর্শা নিক্ষেপ : বর্শা নিক্ষেপের ইংরেজি হলো জ্যাভেলিন থ্রো। বর্শার দৈর্ঘ্য পুরুষের জন্য ২.৬০–২.৭০ মিটার এবং মহিলাদের জন্য ২.২০–২.৩০ মিটার। বর্শার ওজন পুরুষদের ৮০০ গ্রাম, মহিলাদের ৬০০ গ্রাম। রানওয়ে কমপক্ষে ৩৩.৫ মি. হবে। ৮ মি. লম্বা ও ৪ মি. চওড়া একটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করতে হবে। আর্কটি একটি কাঠ ধাতুর তৈরি বস্তু দ্বারা মাটির সমান্তরালে স্থাপন করতে হবে। দুপাশে ৭৫ মি. বাড়ানো থাকবে।

গোলক নিক্ষেপের কৌশল

বর্শা নিক্ষেপের কৌশল : প্রথমে জ্যাভেলিন ধরা শিখতে হবে। কারণ ধরা ভালো হলে ছোড়াও ভালো হবে। ধরা তিন প্রকার–

ক. সামনের আঙুল দিয়ে ধরা (Fore finger grip) : বর্শাটি সামনের আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে হয়।

খ. মধ্যম আঙুল দিয়ে ধরা (Middle finger grip) : মাঝের আঙুল দিয়ে চেপে ধরা।

গ. মধ্যম ও সামনের আঙুলের মাঝখান দিয়ে ধরা (In between fore and middle finger) : সামনের আঙুল ও মাঝের আঙুলের মাঝখানে দিয়ে ধরা।

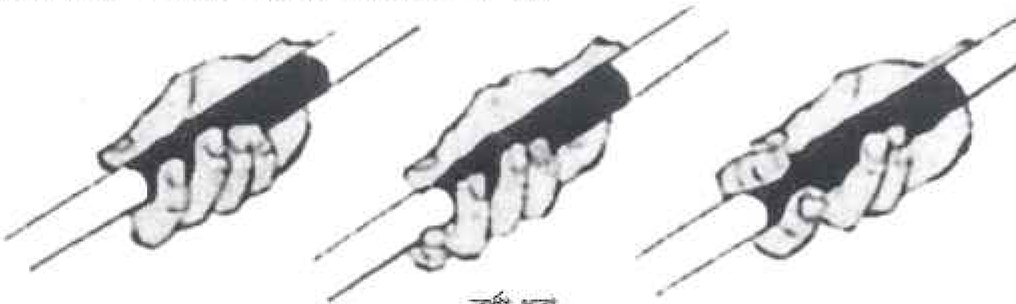

বর্শা ধরা

বহন করা : রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে আসার সময় তিনভাবে জ্যাভেলিন বহন করা যায় ১. কাঁধের নিচ দিয়ে, ২. কাঁধের উপর দিয়ে, ৩. মাথা বরাবর। যার যেভাবে সুবিধা মনে হবে সে সেভাবে জ্যাভেলিন বহন করতে পারে। তবে উঁচু করে বহন করলে সুবিধা হয়।

বর্শা নিক্ষেপ : বর্শা নিক্ষেপের সময় ৪টি ধাপ (Phase) অতিক্রম করতে হয়।

১. দৌড়ে আসা, ২. পাঁচ স্টেপের রিদম, ৩. নিক্ষেপ, ৪. পূর্বের অবস্থায় ফেরা।

১. দৌড়ে আসা : বর্শা ধরে ছোড়ার জন্য রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে আসা।

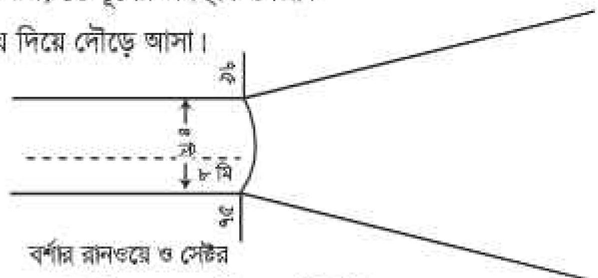

বর্শার রানওয়ে ও সেক্টর

২. পাঁচ স্টেপের রিদম : ছোড়ার আগে রিদমের সাথে পাঁচটি পদক্ষেপ নিয়ে বর্শাটি নিক্ষেপ করতে হয়।

৩. নিক্ষেপ : ৫টি পদক্ষেপ নিয়ে বর্শা ছুড়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।

৪. পূর্বের অবস্থায় ফেরা (Recovery) : ভারসাম্য রক্ষার পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে হয়।

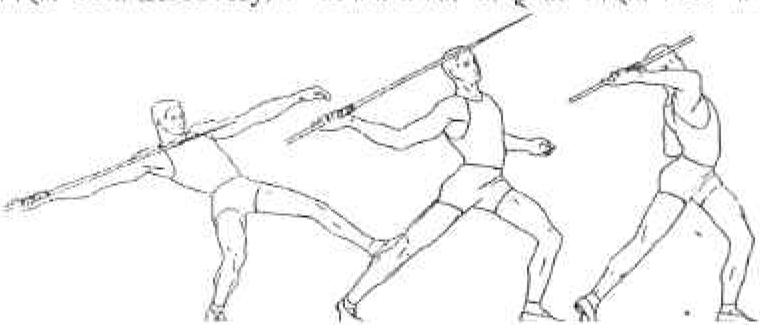

বর্শা নিক্ষেপ

বর্শা নিক্ষেপের নিয়মাবলি

১. বর্শাটি সেক্টরের মধ্যে পড়তে হবে এবং মাথা প্রথমে মাটি স্পর্শ করবে।

২. বর্শা মার্কার স্পর্শ করে বা সামনের দাগ স্পর্শ করে নিক্ষেপ করা যাবে না।

৩. নিক্ষেপের পর পাশের বাড়ানো রেখা অতিক্রম করা যাবে না।

৪. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের ভিতর নিক্ষেপ করতে হবে।

৫. টেপ দ্বারা দুই আঙ্গুলে পেঁচানো যাবে না।

৬. হাতে দস্তানা বা গ্লাভস ব্যবহার করা যাবে না।

৭. শক্ত করে ধরার জন্য হাতে পাউডারজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা যাবে।

৩. চাকতি নিক্ষেপ : চাকতি নিক্ষেপ একটি জনপ্রিয় ফিল্ড ইভেন্ট। ডিসকাস বা চাকতি হলো গোলাকার একটি চাকতি। পুরুষদের জন্য চাকতির ওজন ২ কেজি এবং মহিলাদের জন্য এর ওজন ১ কেজি। চাকতি নিক্ষেপের সার্কেলের ব্যাস ২.৫ মিটার। বৃত্তের চারদিকে লোহার রিং মাটিতে বসানো থাকবে। বৃত্তটি কংক্রিটের ও খসখসে হবে।

চাকতি নিক্ষেপের কৌশল

ক. চাকতি ধরা

চাকতি ধরা

১. প্রথমে বিপরীত হাতে চাকতিটি রাখতে হবে।

২. মসৃণ পিঠ উপরে থাকবে।

৩. যে হাতে নিক্ষেপ করা হবে সে হাতের মধ্যের তিন আঙ্গুলের প্রথম ভাঁজে ডিসকাসকে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে।

৪. বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সাহায্যে সাপোর্ট নিতে হবে।

৫. আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করে রাখতে হবে।

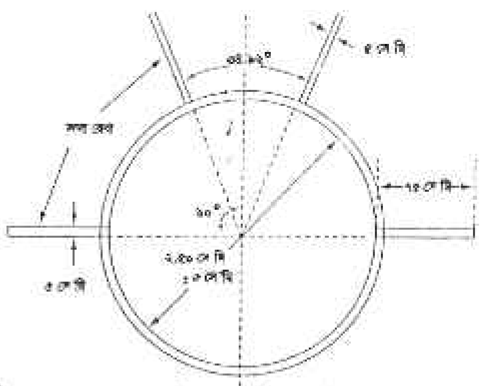

চাকতির সার্কেল ও সেক্টর

চাকতি নিক্ষেপের ধাপসমূহ

চাকতি নিক্ষেপের ধাপ তিনটি। ১. সুইং, ২. টার্ন, ৩. নিক্ষেপ।

১. সুইং : বৃত্তের ভিতর দাঁড়িয়ে চাকতিটি শক্তভাবে ধরে নিক্ষেপকারীর সুবিধা মতো সুইং দিবে।

২. টার্ন : ছোড়ার পূর্ব মুহূর্তে ১ $\frac{1}{2}$ পাক ঘুরে চাকতিটি ছুড়বে।

৩. নিক্ষেপ : ঘোরার সাথে সাথে পায়ের উপর ভর করে নিক্ষেপ করতে হয়। নিক্ষেপের পর এক পায়ের উপর শরীরের ভারসাম্য রাখতে হয়।

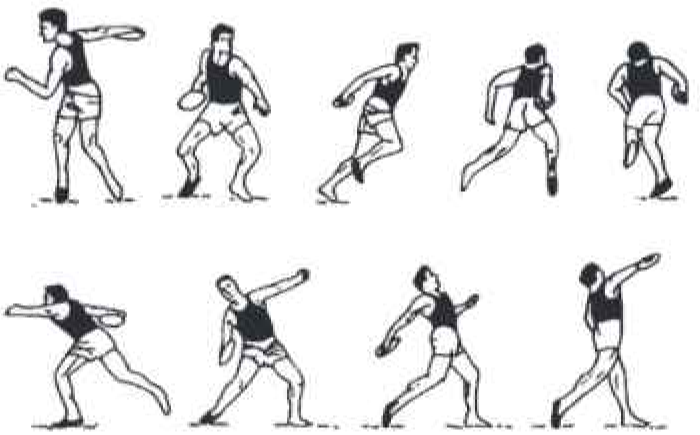

চাকতি নিক্ষেপের কৌশল

নিয়মাবলি

১. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের ভিতর নিক্ষেপ করতে হবে।

২. বৃত্তের মধ্যে থেকে চাকতি নিক্ষেপ করতে হবে।

৩. নিক্ষেপের পর পিছনের অংশ দিয়ে বের হতে হবে।

৪. চাকতিটি সেক্টরের মধ্যে পড়তে হবে।

৫. চাকতিটি শূন্যে থাকা অবস্থায় বৃত্ত থেকে বের হওয়া যাবে না।

৬. সার্কেলের চতুর্দিকের লোহার রিং-এর উপরে স্পর্শ করা যাবে না।

৭. নিক্ষেপের সময় বৃত্তের বাইরের ভূমি স্পর্শ করা যাবে না।

কাজ–১ : গোলক কীভাবে ধরতে হয়? কীভাবে নিক্ষেপ করতে হয় তা দেখাও।
কাজ–২ : গোলক, বর্শা ও চাকতি নিক্ষেপের কৌশল দেখাও।
কাজ–৩ : তিনটি নিক্ষেপের নিয়মকানুন উপস্থাপন করে দেখাও।

পাঠ–৬: সাঁতার : সাঁতার একটি অতি প্রাচীন ক্রীড়া। প্রাচীন যুগে মানুষ বাঁচার জন্য সাঁতার শিখেছে। এজন্য কোনো নিয়মকানুন কলাকৌশলের প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে সুস্বাস্থ্য গঠন ও নির্মল চিত্ত বিনোদনের জন্য সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষেকে আনন্দ দিয়ে আসছে। বর্তমানে যে ধরনের সাঁতার আমরা দেখতে পাই সে সাঁতার প্রথমে ইংরেজরা শুরু করেন। ইংরেজরা প্রথমে ব্রেস্ট স্ট্রোক ও সাইড স্ট্রোক দিয়ে সাঁতার শুরু করেন। ১৮৭৩ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়। আস্তে আস্তে সারা বিশ্বে এর প্রসার ঘটতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ অ্যামেচার সুইমিং ফেডারেশন গঠিত হয়। তখন থেকে এই ফেডারেশন বাংলাদেশে সাঁতারের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সাঁতারের কলাকৌশল : প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার চার রকমের। ১. ফ্রি স্টাইল (Free style), ২. ব্যাক স্ট্রোক বা চিৎ সাঁতার (Back stroke), ৩. ব্রেস্ট স্ট্রোক বা বুক সাঁতার (Breast stroke), ৪. বাটার ফ্লাই বা প্রজাপতি সাঁতার (Butterfly)।

ক. ফ্রি স্টাইল বা মুক্ত সাঁতার : এই সাঁতারে একজন প্রতিযোগী যেকোনো স্টাইলে সাঁতার কাটতে পারে। তবে কীভাবে সাঁতার কাটলে দ্রুত যাওয়া যায় তা সাঁতারু বারবার অনুশীলন করে আয়ত্তে আনতে পারে। এজন্য দেহের অবস্থান, পা ও হাতের কাজ, শ্বাসপ্রশ্বাস—এইসব প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. দেহের অবস্থান : দেহটাকে উপুড় করে পানির সমান্তরালে রাখতে হবে। মাথা পানির সামান্য উপরে থাকবে। তবে পানির মধ্যে মাথার অবস্থান কখনো পানির উপর তুলে, আবার কখনো ঘাড় কাত করে মাঝে মাঝে পরিবর্তন করতে হয়।

২. পায়ের কাজ : পায়ের কাজ কোমর থেকে শুরু হয় এবং সামনে এগোনোর জন্য ডান ও বাম পা একের পর এক উঠা-নামা করে। হাঁটুর কাছে পা সামান্য ভাঁজ করা অবস্থায় থাকে এবং পায়ের পাতা সোজা থাকে। বাম পায়ের গোড়ালি পানির উপর উঠে না। পায়ের পাতা দিয়ে যখন পানিতে চাপ দেওয়া হয় তখন পায়ের পাতা ১২–১৮ ইঞ্চি পরিমাণ পানির নিচে যেতে পারে। পানির মধ্যে দু হাত একবার ঘুরে আসার সময় দুই পা পানির মধ্যে ৬ বার উঠা-নামা করবে। পায়ের কাজকে দু ভাগে ভাগ করা যায়– ক. উপরে কিক, খ. নিচে বিট।

৩. হাতের কাজ : পানিতে দুই হাত একের পর এক মাথার সামনে ফেলতে হবে। এক হাত পানি কেটে শরীরের পাশ দিয়ে কোমরের কাছে যাবে, ঐ সময় কনুই সামান্য ভাঁজ হবে। হাতটি পানির উপর উঠামাত্র অপর হাত মাথার সামনে পানিতে গিয়ে পড়বে। পানিতে হাত পড়ার সাথে হাত দিয়ে পানি কেটে শরীরকে সামনে নিতে হবে। হাত ও পায়ের সমন্বিত কাজের ফলে সাঁতারুর গতি বৃদ্ধি পায়।

৪. শ্বাসপ্রশ্বাস : সাঁতার কাটার সময় মাথাটাকে ঘুরিয়ে পানির উপর মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও নিঃশ্বাস ছাড়া হয়। যে হাত পানির উপরে থাকবে সেদিকে মাথা ঘুরিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালাতে হবে। তবে নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে মুখ পানির মধ্যে ঘুরে যাওয়ার সময়।

খ. ব্যাক স্ট্রোক বা চিত সাঁতার : পানির উপর পিঠ রেখে চিত হয়ে পিছনের দিকে সাঁতার কাটতে হয় বলে একে চিত সাঁতার বলে।

১. দেহের অবস্থান : পানিতে শরীরকে চিত করে রাখতে হবে। সাধারণত মাথাটাকে পানির ভিতর রাখতে হয়। এর ফলে শরীর পানির উপর সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। নাক পানির মধ্যে না ডুবে পানির উপরে থাকবে এবং দৃষ্টি থাকবে পায়ের গোড়ালির দিকে।

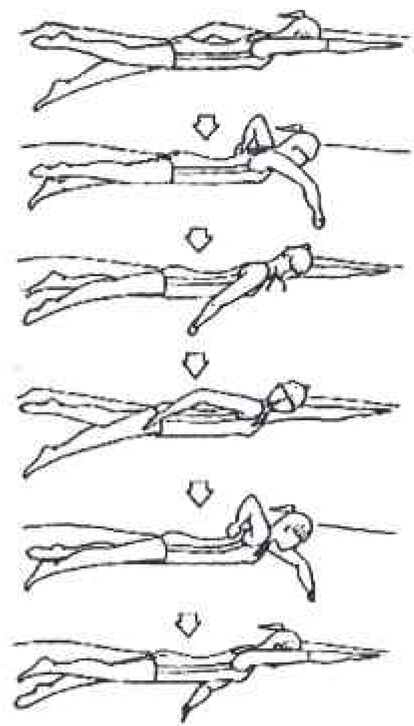

ফ্রি স্টাইল সাঁতার

২. পায়ের কাজ : মুক্ত সাঁতার বা ফ্রি স্টাইলের মতো চিত সাঁতারে পায়ের কাজ করা হয়। মুক্ত সাঁতারে পানির উপর উপুড় হয়ে দু পা পানির মধ্যে থেকে একের পর এক উঠানামা করে। ঠিক তেমনি চিত সাঁতারে পানিতে চিৎ হয়ে থেকে দু পা পানির মধ্যে উঠা নামা করবে। এ সময় পায়ের পাতা সোজা থাকবে।

৩. হাতের কাজ : এক হাত কানের পাশ দিয়ে সোজা পিছনে নেওয়ার পর হাতের তালু ও আঙুল দিয়ে পানি

কেটে শরীরের পাশে নিয়ে আসবে তখন অপর হাত একইভাবে পিছনে গিয়ে পড়বে। এভাবে একের পর এক হাত পিছনে ও পাশে আসবে এবং এর সাথে পায়ের কাজ সমন্বিত হবে।

৪. শ্বাসপ্রশ্বাস : যেহেতু পানির উপর চিত হয়ে থাকার জন্য মুখ উপরের দিকে থাকবে তাই শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে।

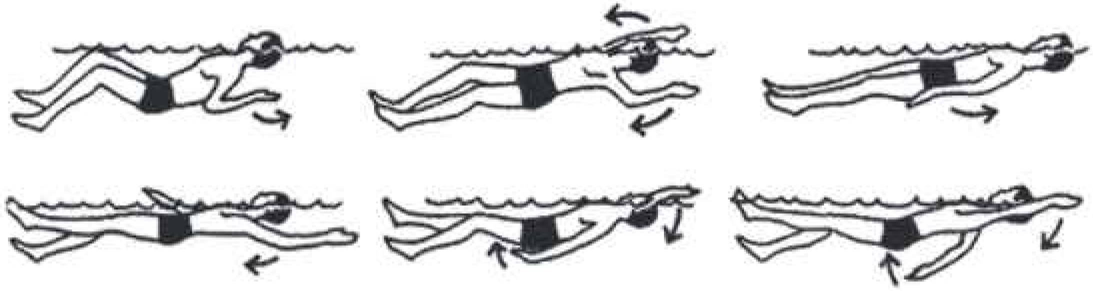

চিত সাঁতার

গ. ব্রেস্ট স্ট্রোক বা বুক সাঁতার : পানিতে বুকের উপর ভর করে এই সাঁতার কাটতে হয় বলে একে বুক সাঁতার বলে।

১. দেহের অবস্থান : দেহ থাকবে পানির উপরিভাগ সমান্তরালে। দেহের পিছনের অংশ কিছুটা পানির মধ্যে থাকে। মাথা থাকবে পানির উপরে। হাতের ও পায়ের কাজের শেষে শরীর যখন সামনে এগোবে তখন নাক ও মুখ পানির কিছুটা নিচে যাবে।

২. পায়ের কাজ : দুই পা-কে একসাথে রাখতে হবে। দুই হাত মাথার সামনে লম্বা করে ফেলে দুই হাত দিয়ে শরীরের দুইপাশে পানি কেটে টেনে আনতে হবে। এ সময় দুই হাঁটু ভাঁজ করে পানির নিচে যাবে, আর দু গোড়ালি এক সাথে কোমরের কাছাকাছি এসে সজোরে পানিতে ধাক্কা দেবে।

৩. হাতের কাজ : দুই হাত একসাথে সামনে প্রসারিত করতে হবে। দুই হাত এক সাথে পানি কেটে শরীরের দু'দিকে আসার সময় কনুই সামান্য ভাঁজ হবে। পানি কেটে আসার পর আবার মুখের সামনে দুই হাত একত্রিত হয়ে সামনে চলে যাবে। এ সময় নাক, মুখ ও কপালের কিছুটা পানির মধ্যে থাকবে।

৪. শ্বাসপ্রশ্বাস: মুখের সামনে দুই হাত প্রসারিত করার পর যখন শরীরের দু'পাশে পানি কেটে আসবে তখন মুখ পানি থেকে উপরে উঠিয়ে শ্বাস নেবে এবং পানির মধ্যে নিঃশ্বাস ছাড়বে।

ঘ. বাটারফ্লাই স্ট্রোক বা প্রজাপতি সাঁতার : চার প্রকার সাঁতারের মধ্যে বাটারফ্লাই স্ট্রোকের সাঁতার সবচেয়ে কঠিন। এতে সাঁতারুকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এর কলাকৌশল আয়ত্ত করতে সাঁতারুকে অনেক অনুশীলন করতে হয়।

১. দেহের অবস্থান : অন্য সকল স্ট্রোকের মতো দেহ যথাসম্ভব পানির উপর সমান্তরাল অবস্থানে থাকবে। যেহেতু শরীরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং মাথা উঠিয়ে শ্বাস নিতে হয় তাই শরীরের পিছনের অংশটুকু একটু পানির নিচে থাকে।

২. পায়ের কাজ : দুই হাত জোড়া অবস্থায় থাকবে। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত যত বেশি নমনীয় হবে, তত জোরে পানিতে জোড় পায়ে আঘাত করা যাবে। দু,পায়ের হাঁটু একটু ভেঙে নিচে ও পিছনে পানিতে ধাক্কা দিতে হবে। ডলফিন মাছ যেভাবে লেজের সাহায্যে পানিতে ধাক্কা দিয়ে চলে সেভাবে পায়ের এই ধাক্কাকে ডলফিন কিক বলে।

৩. হাতের কাজ : দুই হাত একসাথে মাথার সামনে নিক্ষেপ করতে হয়। দুই হাত একসাথে মাথার সামনে চাপ দিয়ে শরীরকে সামনে এগিয়ে নিতে হয়। এর সাথে পায়ের ডলফিন কিকের সমন্বয় ঘটবে। পানির ভিতর থেকে দুই হাত উঠিয়ে যখন সামনে ফেলা হয় তখন খানিকটা প্রজাপতির পাখার মতো দেখতে মনে হবে। তাই একে বাটারফ্লাই স্ট্রোক নাম দেওয়া হয়েছে।

৪. শ্বাসপ্রশ্বাস : একবার হাতের কাজ সম্পন্ন হলে দুইবার পায়ের ডলফিন কিক সম্পন্ন হয়। হাতের সঞ্চালনের কাজ এবং দ্বিতীয়বার পায়ের কিকের সময় মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়। তখন মাথা থাকে পানির উপরে।

বাটার ফ্লাই সাঁতার

ঘূর্ণন (Turning) : ঘূর্ণন সাঁতারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঘুরতে দেরি হলে সময় বেশি লাগে। ঘূর্ণনের সময় সাঁতারের গতি কমানো যাবে না। একজন সাঁতারুকে ঘূর্ণনের সময় পর্যায়ক্রমে নিচের কাজগুলো করতে হয়–

১. দেয়ালের কাছে গিয়ে ঘূর্ণনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

২. ঘূর্ণনের কৌশল মোতাবেক শরীরকে ঘোরাতে হবে।

৩. হাঁটু বাঁকা করে পদদ্বয় দেয়ালের কাছে স্থাপন করতে হবে।

৪. পায়ের পাতা স্থাপন ঠিকমতো হলেই শরীরকে ঘোরাতে হবে।

৫. দেয়ালের সাথে পা ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

৬. গ্লাইডের সময় শরীরকে সোজা রেখে অগ্রসর হতে হবে।

৭. পায়ের ও হাতের কাজ শুরু করতে হবে।

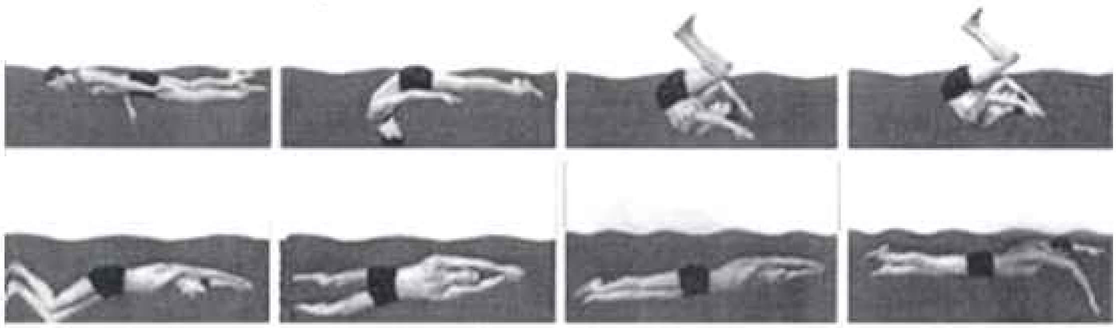

সাঁতারের ঘূর্ণন

সাঁতারের নিয়মাবলি

১. সুইমিং পুলের দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার ও প্রস্থ ২১ মিটার হবে।

২. সুইমিং পুলে লেন থাকে ৮টি, লেনের প্রস্থ ২.৫০ মিটার, পানির গভীরতা ১.৮ মিটার।

৩. আরম্ভ স্থান অপিচ্ছিল হবে এবং পানি থেকে ০.৫০–০.৭৫ মিটার উপরে থাকবে।

৪. আরম্ভকারী আরম্ভের সময় নিচের শব্দগুলো উচ্চারণ করবেন টেক ইউর মার্ক, সেট, পিস্তলের আওয়াজ।

৫. চিত সাঁতার বাদে অন্য সাঁতারগুলো ডাইভ দিয়ে শুরু করতে হবে।

৬. হিটে যে ১ম ও ২য় হবে তাদেরকে ৪ ও ৫ নং লেন দিতে হবে।

৭. ফ্রি স্টাইল ও চিত সাঁতারে এক হাত দিয়ে স্পর্শ করে সাঁতার শেষ করা যায় কিন্তু বুক ও প্রজাপতি সাঁতারে দু হাত দিয়ে ফিনিশিং দেয়াল স্পর্শ করতে হয়।

৮. যদি কোনো সাঁতারু নির্দিষ্ট স্টাইলে না সাঁতরিয়ে অন্য স্টাইলে সাঁতরায় তাহলে সে অযোগ্য হবে।

৯. ব্যাক স্ট্রোক সাঁতারের সময় দেয়ালের সাথে যে হাতল আছে তা ধরে পা দ্বারা পুশ করে চিত হয়ে আরম্ভ করতে হবে।

১০. একজন সাঁতারু লেন পরিবর্তন করতে পারবে না বা অন্য সাঁতারুকে বাধা প্রদান করতে পারবে না।

রিলে : রিলে দুই প্রকার। ক. মিডলে রিলে খ. ব্যক্তিগত মিডলে রিলে।

মিডলে রিলে : চারজন সাঁতারু যখন চারটি স্টাইলে একই দূরত্বে সাঁতার দেয় তাকে মিডলে রিলে বলে। মিডলে রিলের ক্রম– ১. চিত সাঁতার, ২. বুক সাঁতার, ৩. প্রজাপতি সাঁতার, ৪. মুক্ত সাঁতার।

ব্যক্তিগত মিডলে : একজন সাঁতারু যখন একাই ৪টি স্টাইলে সাঁতার দেয় তাকে ব্যক্তিগত মিডলে রিলে বলে। এ রিলের ক্রম হলো– ১. প্রজাপতি সাঁতার, ২. চিত সাঁতার, ৩. বুক সাঁতার, ৪. মুক্ত সাঁতার।

কাজ–১ : মাঠে লম্বা একটি বেঞ্চে এনে তার উপর শুয়ে মুক্ত সাঁতারের হাত ও পায়ের কাজ দেখাও।
কাজ–২ : সবাই এক বা দুই লাইনে দাঁড়িয়ে শরীর সামনে ঝুঁকে হাতের মুভমেন্ট অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ–৭ : অ্যাথলেট ও সাঁতারুদের যোগ্যতা : ইভেন্ট অনুযায়ী যোগ্যতার ভিন্নতা রয়েছে। সব ইভেন্টের জন্য একই ধরনের যোগ্যতা প্রয়োজন হয় না। একেক ইভেন্টের জন্য একেক ধরনের শারীরিক যোগ্যতা ও অন্যান্য যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। যেমন–একজন নিক্ষেপকারীর জন্য যে ধরনের শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় একজন দূরপাল্লার দৌড়বিদের জন্য তার প্রয়োজন হয় না। অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার প্রতিযোগিতা ইভেন্টভিত্তিক ফলে ব্যক্তিগত কলাকৌশলের উপর প্রতিযোগীর সফলতা নির্ভর করে। অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের যোগ্যতা নিচে তুলে ধরা হলো–

১. শারীরিক যোগ্যতা : শারীরিক যোগ্যতা সব খেলার জন্যই প্রয়োজন। কোনো খেলায় শক্তি, কোনো খেলায় দম, কোনো খেলায় গতির প্রয়োজন হয় বেশি। তবে মনে রাখতে হবে শারীরিক যোগ্যতার ইভেন্ট অনুযায়ী পার্থক্য আছে।

ক. স্বল্প দূরত্বের দৌড়বিদ (স্প্রিন্টার) : এ সমস্ত ইভেন্টের দৌড়বিদের জন্য শারীরিক সক্ষমতার ভিতর শক্তি সবচেয়ে প্রয়োজন। বিশেষ করে পায়ের মাসপেশির উন্নতি অপরিহার্য। এর সাথে প্রয়োজন গতির।

খ. দূরপাল্লার দৌড়বিদ : এ দৌড়ের জন্য শারীরিক যোগ্যতার মধ্যে দমের প্রয়োজন হয় বেশি। যাদের দম বেশি তারা এ ইভেন্টগুলোতে ভালো করে। এর সাথে শরীরের অন্যান্য যোগ্যতারও প্রয়োজন রয়েছে।

গ. স্বল্প দূরত্বের সাঁতারু : শারীরিক যোগ্যতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হাতের শক্তি, শরীরের নমনীয়তা, বাকিগুলোরও প্রয়োজন তবে এ দুটোর মতো নয়। এর সাথে আরও অন্যান্য যোগ্যতারও দরকার আছে।

ঘ. দূরপাল্লার সাঁতারু : এসব ইভেন্টের প্রথম যোগ্যতা হলো দম। পানির উপর ভেসে থাকার দক্ষতা ইত্যাদি। এছাড়া হাত ও কাঁধের মুভমেন্টের দক্ষতারও প্রয়োজন।

২. কলাকৌশলের পারদর্শিতা অর্জনের দক্ষতা : যেহেতু এ দুটি প্রতিযোগিতা ব্যক্তি পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে তাই–

ক. রি-অ্যাকশন টাইম : দৌড় ও সাঁতারের ইভেন্টগুলো পিস্তলের আওয়াজের সাথে সাথে শুরু করতে হয় সেজন্য রি-অ্যাকশন টাইম বা প্রতিক্রিয়া ভালো হতে হবে। স্বল্প দূরত্বের দৌড় ও স্বল্প দূরত্বের সাঁতারের জন্য আরম্ভ গুরুত্বপূর্ণ।

খ. সমাপ্তি রেখা স্পর্শ করার যোগ্যতা : সমাপ্তি রেখা স্পর্শ করার দক্ষতাও অত্যন্ত জরুরি। সাঁতারই হোক বা অ্যাথলেটিকস হোক দুটো প্রতিযোগিতাই নিয়মমাফিক স্পর্শ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

গ. যারা নিক্ষেপকারী তাদের ঘোরা, নিক্ষেপ করা ও ফলো-থ্রু করা, ফলো-থ্রু সঠিক করার দক্ষতা থাকতে হবে।

ঘ. সংশ্লিষ্ট ইভেন্টের নিয়মকানুন জানা : সংশ্লিষ্ট ইভেন্টের নিয়মকানুন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

ঙ. আত্মবিশ্বাস : প্রতিযোগীদের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। মনোবল দৃঢ় না হলে ভালো ফলাফল আশা করা যায় না।

চ. শৃঙ্খলা ও আনুগত্যবোধ : প্রত্যেক প্রতিযোগীর শৃঙ্খলা মাধ্যমে অনুশীলন, সঠিক বিশ্রাম করতে হবে। শিক্ষক/প্রশিক্ষকের নির্দেশ মতো কাজ করতে হবে।

কাজ– ১ : দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে এক গ্রুপ সাঁতারের ও অপর গ্রুপ অ্যাথলেটিকসের ইভেন্ট অনুসারে কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন তা আলোচনা করো।

কাজ–২ : সাঁতারের আরম্ভ ও সমাপ্তির নিয়মকানুন বর্ণনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উচ্চলাফের ১ম পর্যায় কোনটি?

ক. টেক অফ খ. দৌড়ে আসা

গ. ক্রসবার অতিক্রম ঘ. ল্যান্ডিং

২. কোন সাঁতারে সাঁতারুর বুক ও মুখ উপরের দিকে থাকে?

ক. বুক খ. মুক্ত

গ. চিত ঘ. প্রজাপতি

৩. টেক অফ বোর্ডের উপরিভাগে কোন রং দিতে হয়?

ক. সাদা খ. লাল

গ. হলুদ ঘ. সবুজ

৪. টেক অফ শব্দটা কোন খেলার সাথে সম্পৃক্ত?

ক. অ্যাথলেটিকস খ. ফুটবল

গ. হকি ঘ. ভলিবল

৫. ডাইভ ছাড়া কোন সাঁতার শুরু করা যায়?

ক. বুক সাঁতার খ. প্রজাপতি সাঁতার

গ. মুক্ত সাঁতার ঘ. চিত সাঁতার

৬. উচ্চলাফে কখন একজন প্রতিযোগী একটি সুযোগ পাবে?

ক. ৬০ সেকেন্ড-এর মধ্যে লাফ দিলে খ. দুই পায়ে টেক অফ নিলে

গ. ১৬ মিটার দূর থেকে দৌড় দিলে ঘ. ৯০ সেকেন্ড-এর মধ্যে লাফ দিলে

৭. ব্যক্তিগত মিডলে রিলে সাঁতারের ক্রমগুলো হচ্ছে–

ক. বুক, চিত, প্রজাপতি, মুক্ত খ. প্রজাপতি, চিত, বুক, মুক্ত

গ. চিত, বুক, প্রজাপতি, মুক্ত ঘ. মুক্ত. চিত, প্রজাপ , বুক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সামিন খেলাধুলায় বরাবরই ভালো। গত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সে ১০০ ও ২০০ মিটার স্প্রিন্টে ১ম হওয়াসহ ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়। তার এই সাফল্যের পর তার ভাই তাকে অ্যাথলেটিকস এর পাশাপাশি সাঁতার অনুশীলনের পরামর্শ দিলে সে নিয়মিত সাঁতার অনুশীলনপূর্বক সাঁতারের একটি ইভেন্টে জাতীয় পর্যায়ে ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সে যে সাঁতারটিতে ১ম হয় তাতে একবার হাতের কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

৮. সামিন কোন সাঁতারটিতে ১ম হয়েছিল?

ক. মুক্ত খ. রিলে

গ. বুক ঘ. প্রজাপতি

৯. অ্যাথলেট সামিনের কোন যোগ্যতাটি সাঁতারু সামিনের সাফল্যের পিছনে বিশেষভাবে কাজ করেছে?

ক. অধিক ক্ষিপ্রতা অর্জন
খ. অধিক শক্তি অর্জন
গ. পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ
ঘ. কলাকৌশল আয়ত্ত করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

আন্তঃস্কুল সাঁতার প্রতিযোগিতায় সাব্বির অংশগ্রহণ করে। সে দেহকে পানির উপরিভাগের সমান্তরাল রেখে দুই হাত মাথার সামনে লম্বা করে ফেলে দুই হাত দিয়ে দুই পাশে পানি কেটে এগোতে থাকে এবং মুখ পানি থেকে উপরে উঠিয়ে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে। প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হতে পারেনি। শারীরিক শিক্ষক তাকে অনুশীলনের মাধ্যমে সাঁতারে ভালো করার দু টি শর্ত পুরণ করতে বলেন এবং দক্ষতা বাড়াতে বলেন।

ক. টর্সো কী?

খ. মাটিতে ভর দিয়ে উপরে উঠাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো।

গ. সাব্বির সাঁতারের কোন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে প্রথম হওয়া সম্ভব-উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

দশম অধ্যায়

খেলাধুলার দুর্ঘটনা

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নানা রকম দুর্ঘটনা জীবনের গতিপথে সাময়িক বাধার সৃষ্টি করে। এসব দুর্ঘটনা নানাভাবে ঘটতে পারে। খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার সময় আকস্মিকভাবে পায়ে ব্যথা পাওয়া, পা মচকে বা হাড় ভেঙে যাওয়া, কেটে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। দুর্ঘটনা অকস্মাৎ ঘটে। তখন আশপাশে কোনো ডাক্তার পাওয়া যায় না। এ সময় রোগীকে তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান দিতে হয়। সেজন্য আমাদের প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। প্রাথমিক প্রতিবিধানের মাধ্যমে আমরা সুস্থজীবন যাপনে সক্ষম হব।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণ

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- প্রাথমিক প্রতিবিধানের গুরুত্ব ও পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব।
- প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণসমূহের বর্ণনা দিতে পারব।
- প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- চামড়া ছড়ে যাওয়া ও ফুলে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- মচকানো ও হাড়ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রতিবিধান বর্ণনা করতে পারব।
- সন্ধিচ্যুতি ও লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- ক্ষতের প্রতিকার করতে পারব।
- নাক দিয়ে রক্ত পড়া ও মাংসপেশিতে টান ধরার প্রাথমিক প্রতিবিধান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানিতে ডুবে গেলে তাৎক্ষণিক করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- কেউ পানিতে ডুবে গেলে তাৎক্ষণিক প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে পারব।
- চামড়া ছড়ে যাওয়া, ফুলে যাওয়া, মচকানো ও হাড়ভাঙা, সন্ধিচ্যুতি ও লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া, ক্ষত, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, মাসলপুল, ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবিধান প্রদানে সক্ষম হব।
- প্রাথমিক প্রতিবিধানের মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ–১ : প্রাথমিক প্রতিবিধানের গুরুত্ব, পদ্ধতি ও উপকরণ : প্রাথমিক প্রতিবিধান হলো চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত একটি প্রাথমিক বিভাগ। এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ একজন প্রতিবিধানকারী কেউ দুর্ঘটনায় বা অসুস্থ হলে তাকে সঠিক পদ্ধতিতে ও যত্নসহকারে প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে পারে। সম্পূর্ণ চিকিৎসা করা প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য নয়। কারণ প্রতিবিধানকারী চিকিৎসক নন। প্রতিবিধানকারী ডাক্তার আসার আগ পর্যন্ত বা হাসপাতালে স্থানান্তর করার আগ পর্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করা, সুস্থ করার পথ সুগম করা এবং রোগীর অবস্থা যেন আরও খারাপ না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে জীবনরক্ষার ভার নেওয়াই হলো প্রাথমিক প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য। First Aid শব্দটি ভাঙলে সহজে প্রাথমিক প্রতিবিধান কী তা বোঝা যায়।

F-Fast (দ্রুত): প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে দ্রুত কাজ সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।

I-Investigation (অনুসন্ধান) : রোগীর অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক সবকিছু অনুসন্ধান করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

R-Relief (আরাম): সর্বপ্রথম রোগীর যন্ত্রণা লাঘব করে আরামের ব্যবস্থা করতে হবে।

S-Sympathy (সহানুভূতি) : রোগীকে সহানুভূতির সাথে দেখতে হবে। তাহলে সে অনেকটা সুস্থ বোধ করবে।

T-Treatment (চিকিৎসা) : প্রতিবিধানকারী দ্রুত তার সাধ্যমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

A-Arrangement (ব্যবস্থা) : রোগীকে প্রাথমিক প্রতিবিধানের পর ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

I-Immediate (তাৎক্ষণিক) : তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিয়ে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

D-Disposal (অপসারণ করা) : দুর্ঘটনা স্থান থেকে রোগীকে সরাতে হবে অর্থাৎ মারাত্মক না হলে বাড়িতে প্রয়োজন হলে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের পদ্ধতি : প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানের পদ্ধতিগুলো হলো–

১. দ্রুত অথচ ঠাণ্ডা মাথায় আগের কাজ আগে ও পরের কাজ পরে করতে হবে।

২. রোগীকে ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিতে হবে।

৩. রোগীর জ্ঞান আছে কি না দেখতে হবে।

৪. শ্বাসপ্রশ্বাসের বিঘ্ন দেখা দিলে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. রক্তক্ষরণ থাকলে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

৬. শক দেখা দিলে তার প্রতিবিধান আগে করতে হবে।

৭. নাড়ির গতির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

৮. রোগীর জ্ঞান না থাকলে শরীরের কাপড়চোপড় আলগা করে দিতে হবে।

৯. রোগী ও তার সাথি বা সকলকে আশ্বাস ও সাহস দিতে হবে।

১০. দর্শক যেন বেশি ভিড় করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. চোখের তারা অস্বাভাবিক কি না, মুখ বিবর্ণ কিনা, মাথায় আঘাত আছে কি না এবং রোগীকে উত্তাপ দিতে হবে কি না এসবের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

১৩. যত শীঘ্র সম্ভব ডাক্তারের নিকট হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণ

নিম্নলিখিত উপকরণগুলো প্রাথমিক প্রতিবিধান করার সময় প্রয়োজন হয়–

১. জীবাণুমুক্ত তুলা বা গজ ২. লিন্ট ৩. স্প্লিন্ট ৪. প্যাড ৫. কাঁচি ৬. ত্রিকোণ ও রোলার ব্যান্ডেজ ৭. ডেটল ৮. প্যাড, ফ্লাট প্যাড ও রিং প্যাড, ৯. আয়োডিন ১০. বেনজিন ১১. একটি চিমটা ১২. সেফটিপিন, ১৩. ব্লেড, সেলাই করার জন্য সুচ, ১৪. স্পিরিট ১৫. লিউকো প্লাস্টার ১৬. আই প্যাড ১৭. এক টিউব বারনল ১৮. একটি ওষুধের ট্রে ১৯. একটি সিরিঞ্জ ২০. একটি ফার্স্ট এইড বক্স।

> কাজ– ১ : প্রাথমিক প্রতিবিধানের গুরুত্বগুলো পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করো।
>
> কাজ–২ : প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর করণীয় কাজ বোর্ডে লিখে দেখাও।
>
> কাজ–৩ : প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণগুলো টেবিলে সাজিয়ে রেখে বেছে বের করতে বলবেন।

পাঠ–২ : প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি–একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন–

১. পর্যবেক্ষণ জ্ঞান : প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী রোগীর আঘাতের কারণ ও চিহ্ন সহজেই পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

২. বিচক্ষণতা : প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী কোনো অপ্রোয়াজনীয় কাজ না করে সহজে রোগীর লক্ষণাদি দেখে আহত জায়গা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ ও সকলের বিশ্বাসভাজন হতে পারে।

৩. অভিজ্ঞতা : প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হাতের কাছে যে সমস্ত জিনিস পাবে তা দিয়েই সে প্রতিবিধানের কাজ চালাতে পারেন সেরকম অভিজ্ঞ হতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে যেন বেশি না হয়।

৪. কর্মদক্ষতা : প্রতিবিধানকারী অযথা রোগীকে যেন কষ্ট না দেয়। অভিজ্ঞতার আলোকে অত্যন্ত সহজ ও নিপুণভাবে কাজটি সম্পন্ন করবে।

৫. সঠিক উপদেশ দান : প্রতিবিধানকারীকে ও তার নিকটস্থ লোকদেরকে উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক উপদেশ বা নির্দেশ দেবেন।

৬. সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ : প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীও আঘাতের গুরুত্ব বুঝে আগের কাজ আগে ও পরের কাজ পরে করবে।

৭. আত্মবিশ্বাস : প্রতিবিধানকারী প্রথমে অসুবিধা হলেও সে যেন প্রতিবিধানের কাজ আত্মবিশ্বাসের সাথে শেষ করে।

৮. সহানুভূতি : প্রতিবিধানকারী রোগীর প্রতি কখনো কঠোর হবে না। রোগী যেন কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ রেখে অন্যদের সাহস দিতে হবে।

> কাজ–১ : প্রাথমিক প্রতিবিধানের দুইটি গুণাবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আলোচনা করবে।
>
> কাজ–২ : তোমার মতে কোন গুণাবলি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা বর্ণনা করো।

পাঠ–৩ : চামড়া ছড়ে যাওয়া, মাংসপেশিতে টান ও ফুলে যাওয়া–দৈনন্দিন চলার পথে ও খেলাধুলা করার সময় আমরা যেকোনো সময় দুর্ঘটনায় পড়তে পারি। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে কোনো কোনো সময় দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা সম্ভব। আর যদি দুর্ঘটনা ঘটেই যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। খেলাধুলা করার সময় আমরা বিভিন্নভাবে দুর্ঘটনায় পড়তে পারি।

দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলো মেনে চলা প্রয়োজন–

১. খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার পূর্বে শরীর ভালোভাবে গরম করে খেলার উপযোগী করে নিতে হবে।

২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যায়াম বা খেলাধুলা করা উচিত নয়।

৩. ব্যায়াম করার সময় নিজের উচ্চতা ও ওজন অনুসারে সঙ্গী বেছে নিতে হবে।

৪. পিচ্ছিল, ভেজা, ও ইটপাটকেলযুক্ত মাঠে খেলা করা উচিত নয়।

৫. গাছ বা বৈদ্যুতিক তারের কাছে খেলাধুলা করা উচিত নয়।

এগুলো মেনে চললে দুর্ঘটনা অনেকটাই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

১. চামড়া ছড়ে যাওয়া : হাতুড়ি, পাথর বা কোনো ভোঁতা জিনিসের আঘাতে বা খেলার সময় বুটের আঘাতে চামড়া ছড়ে যেতে পারে। চামড়া ছড়ে গেলে ঐ স্থানটি থেতলানো, রক্তজমা ও কালশিটেযুক্ত হয়।

প্রাথমিক প্রতিবিধান–

১. ছড়ে যাওয়া থেঁতলানো জায়গায় ঠান্ডা পানি বা বরফ লাগাতে হবে।

২. পরিষ্কার তোয়ালে বা কাপড় ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বেঁধে রাখতে হবে। শুকিয়ে গেলে পুনরায় ভিজিয়ে দিতে হবে।

৩. রক্ত বের হলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. জীবাণুমুক্ত তুলা দিয়ে জমাট রক্ত মুছে মলম লাগাতে হবে।

৫. প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

২. মাংসপেশিতে টান ধরা : খেলাধুলা করার সময় বা ভারী কোনো জিনিস তোলার সময় মাংসপেশিতে টান লেগে মাংসপেশির আঁশ ছিঁড়ে ব্যথা অনুভূত হয় ও চলতে গেলে খুব কষ্ট হয়। কোনো কোনো সময় আহত স্থানে ফুলে ওঠে এবং কালশিরা পড়ে যায়। এ অবস্থাকে মাসলপুল বা মাংসপেশিতে টান বলে। এরূপ হলে আহত স্থানটিকে বিশ্রাম দিয়ে বরফ লাগাতে হবে। ২৪ ঘণ্টা পর গরম পানিতে বোরিক পাউডারের কমপ্রেস প্রয়োগ করতে হবে। অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের মাংসপেশিতে টান ধরে বেশি।

৩. ফুলে যাওয়া : ফুটবল খেলার সময় বুটের আঘাতে, বক্সিং খেলার সময় মুষ্টির আঘাতে বা পড়ে গিয়ে আঘাত লেগে শরীরের কোনো স্থান ফুলে যেতে পারে। এর প্রথম কাজই হলো বরফ লাগানো। কিছুক্ষণ বরফ লাগালে ফোলা আস্তে আস্তে কমে যাবে। এর পরেও যদি ব্যথা থাকে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

কাজ–১ : চামড়া ছড়ে গেলে তার প্রাথমিক প্রতিবিধান করে দেখাও।
কাজ–২ : মাংসপেশিতে টান ধরার কারণ ও এর প্রতিবিধান বর্ণনা করো।

পাঠ–৪ : সন্ধিচ্যুতি, মচকানো ও হাড়ভাঙ্গা এবং লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া

১. সন্ধিচ্যুতি : শরীরের একটি অস্থি/হাড় অন্য হাড়ের সাথে যেখানে মিলিত হয়েছে ঐ স্থানকে সন্ধিস্থান বলে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক হাড়ের সংযোগ স্থানের নাম সন্ধি। এই সন্ধির স্থান থেকে যদি হাড়ের বিচ্যুতি ঘটে তাকে সন্ধিচ্যুতি বলে। কাঁধ, কনুই, কব্জি, বৃদ্ধাঙ্গুল, নিম্ন চোয়াল, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালি ইত্যাদির সন্ধিস্থানের সন্ধিচ্যুতি ঘটতে পারে। অনেক সময় সন্ধিচ্যুতি ও হাড়ভাঙা একই সময়ে হয়ে থাকে।

সন্ধিচ্যুতির লক্ষণ : ১. সন্ধিস্থান ফুলে যাওয়া, ২. সন্ধিস্থানে ব্যথা অনুভব করা, ৩. সন্ধিস্থান নড়াচড়া করানো যায় না, ৪. সন্ধিস্থানের হাড় সরে গিয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করা।

সন্ধিচ্যুতির প্রাথমিক প্রতিবিধান–

১. আহত অঙ্গ যথাসম্ভব আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে।

২. আহত অঙ্গ নাড়াচড়া করা যাবে না।

৩. সংযোগ বিচ্যুতি অস্থি দুটিকে সংযোগ দিতে হবে বা সংযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৪. সন্ধিচ্যুতর স্থানে ভেজা কাপড় বা বরফ লাগাতে হবে।

৫. প্রয়োজনে হাড়ভাঙার ব্যান্ডেজ ব্যবহার করবে।

৬. রোগীর শক লাগলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. হাড়ভাঙার সন্দেহ হলে হাড়ভাঙার ব্যান্ডেজ করতে হবে।

৮. রোগীকে যথাসম্ভব দ্রুত ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২. মচকানো ও হাড়ভাঙার

২.১ অস্থি বা হাড়ের জোড়া লাগানোর স্থানে শক্ত লিগামেন্ট হাড়ের জোড়াকে একসাথে রাখে। কোনো কারণে যদি এই লিগামেন্ট টানটান হয় কিংবা ছিঁড়ে যায় তাহলে হাড়ের সন্ধিস্থলে প্রচণ্ড ব্যথা হয় এবং আহত স্থানের চারপাশ ফুলে ওঠে। একে অস্থিসন্ধির মচকানো বলে। খেলাধুলা বা ব্যায়ামের সময় মচকালে স্থানটিকে সবচেয়ে আরামদায়ক অবস্থানে রাখতে হবে। এরপর তুলা বেশ পুরু করে আহত স্থানের উপরে ও নিচে দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ করতে হবে।

২.২ হাড়ভাঙা : শরীরের কোনো হাড় ভেঙে গেলে একে হাড় ভেঙে বা Fracture বলে। হাড়ভাঙা নানা প্রকার হতে পারে। যেমন– ক. সাধারণ হাড়ভাঙা খ. কম্পাউন্ড হাড়ভাঙা গ. জটিল হাড়ভাঙা।

২.২.১ সাধারণ হাড়ভাঙা : এই হাড়ভাঙা শরীরের অভ্যন্তরে ঘটে। প্রথমে হাড়ের দুই মাথা সোজা করে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। তারপরে স্প্লিন্ট দিয়ে বেঁধে অনড় করতে হবে।

২.২.২ কম্পাউন্ড ফ্রাকচার : একে উন্মুক্ত ফ্রাকচারও বলে। কারণ এই ফ্রাকচারের ভাঙাহাড় চামড়া ভেদ করে শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসে। ভাঙাহাড় যতটা সম্ভব সোজা করে শক্তভাবে ব্যান্ডেজ করতে হবে যেন ঐ স্থান অনড় থাকে।

২.২.৩ কমপ্লিকেটেড ফ্রাকচার : এই ফ্রাকচারের ভাঙা হাড়ের প্রান্ত শরীরের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যথা– কিডনি, লিভার, ফুসফুস বা কোনো রক্তনালিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এছাড়াও আরও কয়েক প্রকার হাড়ভাঙা রয়েছে, যেমন–

১. কমিনিউটেড– হাড় ভেঙে কয়েক টুকরা হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়।

২. ইমপ্যাক্টেড– যেখানে হাড়ের ভাঙা প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

৩. গ্রিনস্টিক– বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে হাড় না ভেঙে কেবল চির খেয়ে যায়। কচি নিম ডাল খানিকটা দুমড়ে ছেড়ে দিলে যেমন হয়।

হাড় ভেঙে গেলে করণীয়–

১. সাথে সাথে রোগীর চিকিৎসা শুরু করতে হবে। কারণ রোগীকে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তর করা সম্ভব হয় না।

২. আঘাতপ্রাপ্ত স্থানকে অনড় করতে হবে যাতে নড়াচড়া করতে না পারে।

৩. স্প্লিন্ট ব্যবহার করে আহত অঙ্গ অনড় করতে হবে।

৪. রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া : লিগামেন্ট জয়েন্টের সাথে সম্পৃক্ত। জয়েন্টে লিগামেন্ট, টেনডন ও মেমব্রেন দ্বারা বেষ্টিত। চ্যাপ্টাজাতীয় বন্ধনীর নাম লিগামেন্ট। লিগামেন্ট দুই হাড়ের নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। এদের উপরে আছে টিস্যুর বন্ধনী ফলে সংযোগ স্থানটি আরও মজবুত করেছে। কখনো যদি অসমান্তরাল জায়গায় পা পড়ে, বাস থেকে নামার সময় জয়েন্টে ঝাঁকি লাগে বা দৌড়ের সময় জয়েন্টে কোনো কারণে আঘাত লাগলে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। আহত স্থানটি ফুলে যায় ও ব্যথা অনুভূত হয়। ঐ অঙ্গ নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। সাথে সাথে বরফ লাগাতে হবে এবং বিশ্রামে থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

কাজ–১ : সন্ধিচ্যুতি কেন হয়? এর প্রাথমিক প্রতিবিধান আলোচনা করো।

কাজ–২ : হাড় ভাঙা কত প্রকার ও কী কী? হাড় ভেঙে গেলে তার প্রতিবিধানের বিশদ বর্ণনা দাও।

পাঠ–৫ : ক্ষত, ক্ষতের প্রকারভেদ ও প্রতিকার–শরীরের কোনো তন্তু ছিন্ন অথবা দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত হলে বা তন্তু ছিদ্র হলে তাকে ক্ষত বলে। সাধারণভাবে ত্বক কেটে রক্তপাত হলে তাকেও ক্ষত বলে। ক্ষত পাঁচ প্রকার–

১. পিষ্ট ক্ষত (Confused wound)।

২. ছিন্ন ভিন্ন ক্ষত (Lacerated wound)।

৩. কর্তনজনিত ক্ষত (Incised wound)।

৪. বিদ্ধ ক্ষত (Punctured wound)।

৫. মিশ্রজাতীয় ক্ষত (Mixed wound)।

১. পিষ্ট ক্ষত : মানুষের দেহে সূক্ষ্মভাবে গ্রথিত কোষসমূহ ভারী বস্তুর আঘাতের ফলে চামড়ার কোনো ক্ষতি না হয়ে অন্তঃস্থ ক্যাপিলারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রক্তপাত হয়। কিন্তু সেই রক্ত বাইরে বেরোতে না পেরে ভিতরে জমে থাকে তাকে পিষ্ট ক্ষত বলে। এই ধরনের ক্ষতে দৃশ্যমান রক্তপাত হয় না।

২. ছিন্নভিন্ন ক্ষত : জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণে, মেশিনে থেঁতলালে ও গোলাগুলির আঘাতে যে ক্ষত হয় তাকে

ছিন্নভিন্ন ক্ষত বলে। ক্ষতগুলো অসমান বা বিক্ষিপ্তভাবে থাকে।

৩. কর্তনজনিত ক্ষত : কোনো ধারালো অস্ত্র যেমন—ব্লেড, ক্ষুর, ছুরি, বঁটি, ভাঙ্গা কাচ দ্বারা কেটে যে ক্ষত হয় তাকে কর্তনজনিত ক্ষত বলে। এই ধরনের ক্ষতে ত্বক ও রক্তনালি মসৃণভাবে কেটে যায় এবং অবিরামভাবে রক্তপাত হয় সহজে বন্ধ করা যায় না।

৪. বিদ্ধক্ষত : ক্ষতটা গভীর হয়। সে তুলনায় মুখের পরিসর বড় হয় না এ ক্ষতকে বিদ্ধ ক্ষত বলে। যেমন– সুচ, পেরেক, ছুরি, তার ও তারকাঁটা ইত্যাদি দ্বারা এ ক্ষত হয়। রক্তপাত প্রচুর হতে পারে নাও পারে।

৫. মিশ্রক্ষত : উপরে বর্ণিত একাধিক ক্ষত একত্র মিলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাকে মিশ্র ক্ষত বলে। যেমন– গুলির ক্ষত, ক্ষতের মুখের পরিসর ছোট এবং অভ্যন্তরে কতটা গভীর তা দেখে বোঝা যায় না। অপর দিকে যেখান দিয়ে গুলি বের হয়েছে সে স্থান বড় ও আকারে অসমানভাবে ক্ষত থাকে। এই ক্ষতটি একদিকে বিদ্ধক্ষত অপর দিকে ছিন্নভিন্ন ক্ষত। দুটি মিলিত হয়ে মিশ্রজাতীয় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষতের প্রাথমিক প্রতিবিধান–

১. রোগীকে শুইয়ে দিতে হবে যেন রোগী সহজ ও নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকতে পারে।

২. ক্ষত স্থানকে হার্ট লেভেল বা হৃৎপিণ্ডের সমতার উপরে রাখতে হবে যাতে ক্ষত স্থান থেকে রক্ত চলাচল কমে রক্ত পড়া থেমে যায়।

৩. আহত হওয়ার সাথে সাথে আহত স্থানে বরফ লাগাতে হবে।

৪. রোগী যথাসম্ভব কম নড়াচড়া করবে।

৫. ক্ষতস্থান এন্টিসেপ্টিক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৬. রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ চাপ দিতে হবে।

৭. ক্ষতস্থানে কিছু শক্তভাবে ঢুকলে তা তুলে ফেলতে হবে।

৮. ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধলে উক্ত জমাট রক্ত সরাতে চেষ্টা করবে না।

৯. শক পেলে প্রথমে তার চিকিৎসা করতে হবে।

১০. ক্ষতস্থানে জীবাণুমুক্ত প্যাড ব্যবহার করতে হবে।

১১. আহত অঙ্গকে ব্যান্ডেজ বেঁধে স্থির রাখতে হবে।

১২. কোনো উত্তেজক দ্রব্য বা পানীয় পান করতে দেওয়া যাবে না।

১৩. দ্রুত রোগীকে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

একজন রোগীর ক্ষত চিকিৎসা করতে গেলে প্রতিবিধান করার কিছু জ্ঞান থাকা দরকার।

ক. কীভাবে কেটেছে, তা কোন পর্যায়ে পড়ে, কর্তনজনিত ক্ষত/ছিন্নভিন্ন ক্ষত, পিষ্টক্ষত না বিদ্ধক্ষত ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত হতে হবে।

খ. প্রথমে করণীয় ঠিক করে নেওয়া। রক্তক্ষরণ হলে প্রথমে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। তারপর ইনফেকশন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা। শক লাগলে তার প্রতিবিধান করা।

গ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে যথারীতি ড্রেসিংয়ের ব্যবস্থা করা, রক্তক্ষরণ থাকলে তা বন্ধ করা। সেপটিক যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। Toxoid Injection নিতে বলা ইত্যাদি।

ঘ. শক লাগলে প্রথমে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চালু করা।

ঙ. রোগীর অবস্থা বুঝে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

কাজ–১ : ক্ষত কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? তা পোস্টার পেপারে লিখে ঝুলিয়ে রাখো।

কাজ–২ : চার দলে বসে চারটি ক্ষতের প্রাথমিক প্রতিবিধানগুলো আলোচনা কর ও বোর্ডে এসে উপস্থাপন করো।

পাঠ–৬ : নাক দিয়ে রক্ত পড়া, পানিতে ডুবে যাওয়া, উদ্ধার পদ্ধতি ও কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রদান।

১. নাক দিয়ে রক্ত পড়া : খেলাধুলা করার সময় সামান্য আঘাত লাগলেই নাক দিয়ে রক্ত বের হয়। বিশেষ করে বক্সিং খেলার সময় এ দুর্ঘটনা বেশি ঘটে থাকে।

ক. প্রথমে রোগীকে চেয়ারে বসিয়ে বা চিত করে শুইয়ে মুখ পিছনের দিকে সামান্য হেলিয়ে রাখতে হবে।

খ. মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে বলতে হবে।

গ. নাক হালকাভাবে চেপে ধরে রাখতে হবে।

ঘ. জমাট বাঁধা রক্ত সরাতে হয় না, এতে রক্ত আরও বেশি বের হয়।

ঙ. বরফ বা ঠান্ডা পানি লাগালে রক্ত পড়া তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়।

২. পানিতে ডোবা : আমাদের চারপাশে অসংখ্য ডোবা, নালা, পুকুর রয়েছে। সেজন্য সকলেরই সাঁতার জানা দরকার। সাঁতার না জানলে কখনোই পানিতে নেমে গোসল করা উচিত নয়। পা পিছলে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পানি উপরে তুলে গোসল করলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। যদি কেউ পানিতে পড়ে যায়, সাথে সাথে ভাসমান কোনো কিছু পানিতে ছুড়ে দিয়ে বা সাঁতরিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে রোগী যেন উদ্ধারকারীকে জড়িয়ে ধরে তার জীবন বিপন্ন না করে। রোগী যদি পানি খায় তাহলে পানি দ্রুত বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে শ্বাসনালিতে পানি ঢুকে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ডুবে যাওয়া রোগীকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে–

শিশু হলে

ক. পায়ের গোড়ালি উঁচু করে ধরতে হবে। মাথা নিচের দিকে থাকবে। মাঝে মাঝে পিঠে হালকা চাপ দিতে হবে। এতে গিলে খাওয়া পানি বের হয়ে আসবে। মুখে যদি জলজ উদ্ভিদ ঢোকে তাও বের হয়ে আসবে।

খ. কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. ভেজা কাপড় খুলে ফেলতে হবে।

ঘ. মেডিকেল সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে যেতে হবে।

বয়স্ক লোক হলে

ক. প্রথমে রোগীর গলা, মুখ পরিষ্কার করতে হবে।

খ. রোগীর হাঁটু ভাঁজ করে চেয়ার বা টুলের উপর এমনভাবে বসাতে হবে যেন মাথা ঝুলে থাকে। পিঠে হালকা চাপ দিলে গিলে খাওয়া পানি বের হয়ে আসবে।

গ. ভেজা কাপড় খুলে ফেলতে হবে।

ঘ. মেডিকেল সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে যেতে হবে।

২. কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া : রোগীর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া চালু করতে হয় তাকে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া বলে। কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া হাত দিয়ে বা যন্ত্রের সাহায্যে

দেওয়া হয়। হাত দ্বারা চাপ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার লক্ষ হচ্ছে যাতে রোগীর ফুসফুসে মিনিটে ১০-১২ বার ছোট ও বড় করা যায়। ছোট হওয়ার সাথে সাথে ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে যায় একে বলে নিঃশ্বাস। বড় হলে বাতাস প্রবেশ করে, একে বলে প্রশ্বাস। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস দেওয়ার কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতি আছে। বহুল প্রচলিত পদ্ধতিগুলো হলো–

১. সেফার (Schafer) পদ্ধতি।

২. সিলভেস্টার (Silvesters) পদ্ধতি।

৩. হোলজার নিলসন (Holger Neilson) পদ্ধতি।

৪. মুখে মুখ লাগানো (Mouth to Mouth) পদ্ধতি।

১. সেফার পদ্ধতি : রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। তার মুখ থাকবে নিচের দিকে। হাত দুটি মাথার দু'পাশে ছড়ানো থাকবে। মাথা এক পাশ করে দিতে হবে যাতে তার নাক মাটিতে লেগে না থাকে। পরনের কাপড় চোপড় খোলার জন্য সময় নষ্ট করা উচিত নয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী রোগীর মাথার দিকে মুখ করে কোমর বরাবর সমান্তরাল হয়ে পাশে হাঁটু গেড়ে বসবে। তারপর রোগীর কোমরের দু'পাশে নিজের দুটি হাত এমনভাবে রাখতে হবে যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটি সামনের দিকে এবং অন্য আঙ্গুলগুলো কোমরের দুই পাশে আড়াআড়িভাবে ছড়িয়ে থাকবে। নিজের হাত দুটি এবং কনুই ঠিক সোজা রাখতে হবে। তারপর কনুই না বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চাপ দিতে হবে। এ চাপ পেটের সমস্ত অন্ত্রে পড়বে এবং ফুসফুসের বায়ু বেরিয়ে আসবে। তারপর ধীরে ধীরে চাপ ছেড়ে দিতে হবে। চাপ দেওয়া এবং ছাড়া এ দুটি কাজ ৫ সেকেন্ডের ভিতর করতে হবে। চাপ দিতে ২ সেকেন্ড ও ছাড়তে ৩ সেকেন্ড এই মোট ৫ সেকেন্ড। যতক্ষণ শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক না হয় ততক্ষণ এ প্রক্রিয়া চলবে।

২. সিলভেস্টার পদ্ধতি : রোগীকে প্রথমে চিত করে শোয়াতে হবে। রোগীর ঘাড়ের নিচে একটি ছোট বালিশ দিতে হবে। মাথাটা বালিশের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যেন মাথা সামনের দিকে থাকে। জামা কাপড় খুলে ফেলতে হবে। জিহ্বা উল্টে যেন বাতাস বন্ধ করে না দেয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। রোগীকে শুইয়ে দুই হাত দিয়ে তার কনুই দুটি সজোরে উপরের দিকে টেনে তুলতে হবে। তারপরে সজোরে কনুই দুটি বুকের দু পাশে রাখতে হবে। যাতে বুকের দু পাশে চাপ পড়ে। এভাবে একবার চাপ পড়বে আবার চাপ ছাড়তে হবে। মোট সময় ৫ সেকেন্ড। নাকের কাছে এক টুকরা কাগজ ধরে দেখতে হবে শ্বাস পড়ছে কি না? শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ ক্রিয়া চলতে থাকবে।

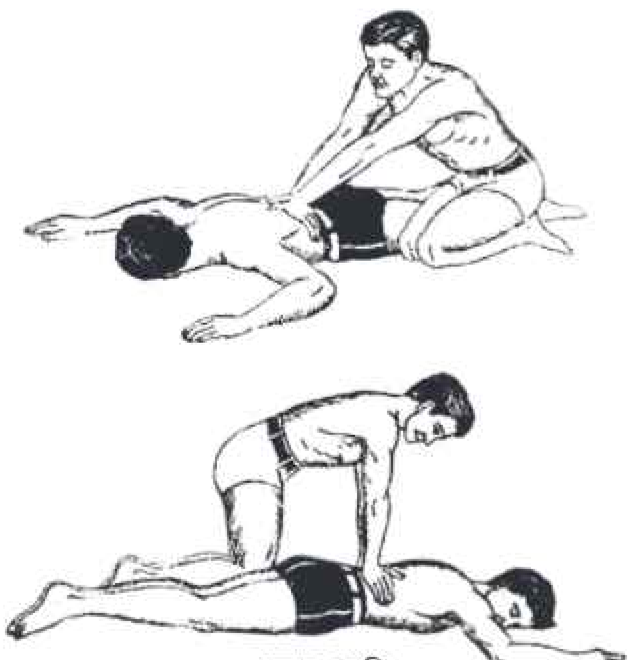

সেফার পদ্ধতি

৩. হোলজার নিলসন পদ্ধতি : রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে।

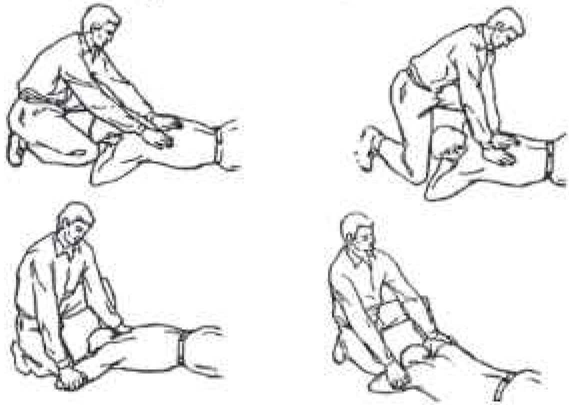

হোলজার নিলসন পদ্ধতি

ক. প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী রোগীর মাথার দিকে হাঁটু ভাঁজ করে বসবে।

খ. রোগীর পিঠে চাপ দিতে হবে। তারপর রোগীর বাহু দুটি উঠা-নামা করাতে হবে। মনে রাখতে হবে যদি শোল্ডার জয়েন্ট বা তার কাছাকাছি কোথাও অস্থিভাঙা থাকে তাহলে এ পদ্ধতি চলবে না।

চাপ দেয়ার নিয়ম–

এক, দুই– পিঠে চাপ সৃষ্টি

তিন– একটু থামতে হবে

চার, পাঁচ– বাহুতে টান সৃষ্টি

ছয়– কিছুক্ষণ থাম।

এই প্রক্রিয়ায় রোগীকে প্রতি মিনিট ১০/১২বার শ্বাসপ্রশ্বাস দেওয়া যায়। প্রতিবারে বাতাস চলাচলের পরিমাণ ১ লিটার।

৪. মুখে মুখ লাগানো পদ্ধতি : কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের একটি সহজ পদ্ধতি হলো মুখে মুখ লাগানো পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ফুসফুসে বাতাস ঢোকানো যায়। এ পদ্ধতি খুবই সহজ ও পরিশ্রমও কম। অল্প বয়স্করাও সহজে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে। তবে নৈতিক দিক দিয়ে এ পদ্ধতি অনেক সময় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রশ্বাস না পেলে এই ধরনের প্রক্রিয়া বহু আগে থেকে চালু আছে। মুলত প্রতিবিধানকারীর লক্ষ্যই হলো যেকোনো উপায়ে রোগীকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। মুখের ভিতরে ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে, এক হাত দিয়ে রোগীর মাথা চেপে ধরে, অপর হাত নিম্ন চোয়াল ধরে মুখ ফাঁক করে নিজে শ্বাস পুরো গ্রহণ করে রোগীর মুখ ঠোঁট দিয়ে আটকে ধরে বাতাস ঢোকাতে হবে। এভাবে ১০-১২ বার বুক ফুলানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

কাজ–১ : নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধের উপায়গুলো লেখো ও উপস্থাপন করো।

কাজ–২ : কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া কাকে বলে? বর্ণনা করো।

কাজ–৩ : কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার তোমার কাছে যে পদ্ধতিটি সহজ মনে হবে সেটি হাতে কলমে করে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন অবস্থাকে মাসলপুল বলে?

ক. চামড়া ছিঁড়ে গেলে	খ. পেশিতে টান ধরলে

গ. শরীরের কোনো স্থান ফুলে গেলে	ঘ. লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেলে

২. সন্ধিচ্যুতির ফলে কী হয়?

ক. হাড় সরে যায়	খ. লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়

গ. ক্ষতের সৃষ্টি হয়	ঘ. হাড় ভেঙে যায়

৩. ভাঙা হাড়কে অনড় রাখা যায় যায় কীভাবে?

ক. লিন্ট	খ. স্প্লিন্ট

গ. ব্যান্ডেজ	ঘ. প্যাড

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

স্কুল ছুটি শেষে রনি রাস্তা পারাপারের সময় অটো রিকশার ধাক্কায় ছিটকে পড়ে যায়। রাস্তার লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখল তার পায়ের হাড় ভেঙে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেন।

৪. রনির হাড় ভাঙার ধরন কী?

ক. কমিনিউটেড	খ. ইমপ্যাক্টেড

গ. গ্রিন স্টিক	ঘ. কম্প্লিকেটেড

৫. রনির হাড় ভাঙ্গার চিকিৎসায় ডাক্তারের করণীয়–

i. আঘাতপ্রাপ্ত স্থানকে অনড় রাখতে হবে

ii. স্প্লিন্ট ব্যবহার করে আহত অঙ্গ অনড় করতে হবে

iii. বেশি করে গরম সেঁক দিতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii

গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শাকিল কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রে গোসল করার সময় ঢেউয়ের ধাক্কায় পানিতে ডুবে যায়। এক দর্শনার্থী তাকে উদ্ধার করে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে তার মাথার দিকে হাঁটু গেড়ে বসে পিঠে চাপ দিতে থাকে এবং শাকিলের বাহু দু টি উঠানামা করতে থাকে।

৬. শাকিলের উপর ব্যবহৃত পদ্ধতিটির নাম কী?

ক. হোলজার নিলসন খ. সিলভেস্টার

গ. সেফার ঘ. মুখে মুখে

৭. শাকিলের পিঠে কেন চাপ দেয়া হয়?

ক. রোগীর সাথে কথা বলার জন্য খ. রোগীর আরামের জন্য

গ. কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ঘ. পেটের পানি বের করার জন্য

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রঞ্জু বন্ধুদের সাথে কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে যায়। একটু পরে ভেসে উঠে। তখন বন্ধুরা তাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করার জন্য মুখে মুখে শ্বাস গ্রহণ করে এবং পেট থেকে পানি বের করার জন্য মুখ ও গলা পরিষ্কার করে দেয়। শেষ পর্যন্ত রঞ্জু সুস্থ হয়ে উঠে।

ক. ইমপ্যাক্টেড কী?

খ. কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. রঞ্জুর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মুখে মুখে পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মুখ ও গলা পরিষ্কার করতেই রঞ্জু সুস্থ হয়' এ বক্তব্যটির সাথে কি তুমি একমত - তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. সড়ক দুর্ঘটনায় মরিয়মের পায়ের গোড়ালিতে আঘাত পায়। তার পা ফুলে যায়, এতে সে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। উদ্ধারকারীর একজন তার আঘাতটি পর্যবেক্ষণ করে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ঠান্ডা পানি দিয়ে দেয় এবং নড়াচড়া করতে বারণ করেন।

ক. কমিনিউটেড কী?

খ. সন্ধিচ্যুতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. মরিয়মের আঘাতটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্ধারকারীর কাজ কি মরিয়মের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট বলে তুমি মনে কর? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল নবম ও দশম : শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা

অন্যকে ক্ষমা করো,
কিন্তু নিজেকে কখনোই ক্ষমা করো না।
–সাইরাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।